

2016 2017 2018 2019

\*রক্তকণিকা ও লসিকা \_\_\_\_\_

\*রক্ত জমাট বঁধা \_\_\_\_\_

\*হৃদপিণ্ডের গঠন \_\_\_\_\_

\*হার্টবিট বিভিন্ন দশা ও এর নিয়ন্ত্রণে SA নোড, AV নোড,  
রক্তচাপ ও মারকিনজি আঁশের ভূমিকা \_\_\_\_\_

\*হৃদপিণ্ডের কম্পাটিকাসূমহ \_\_\_\_\_

\*রক্তচাপ ও ব্যারোরিসেপ্টর এবং  
আয়তন রিসেপ্টর এর ভূমিকা \_\_\_\_\_

\*মানবদেহে দ্বিচক্রী সংবহন \_\_\_\_\_

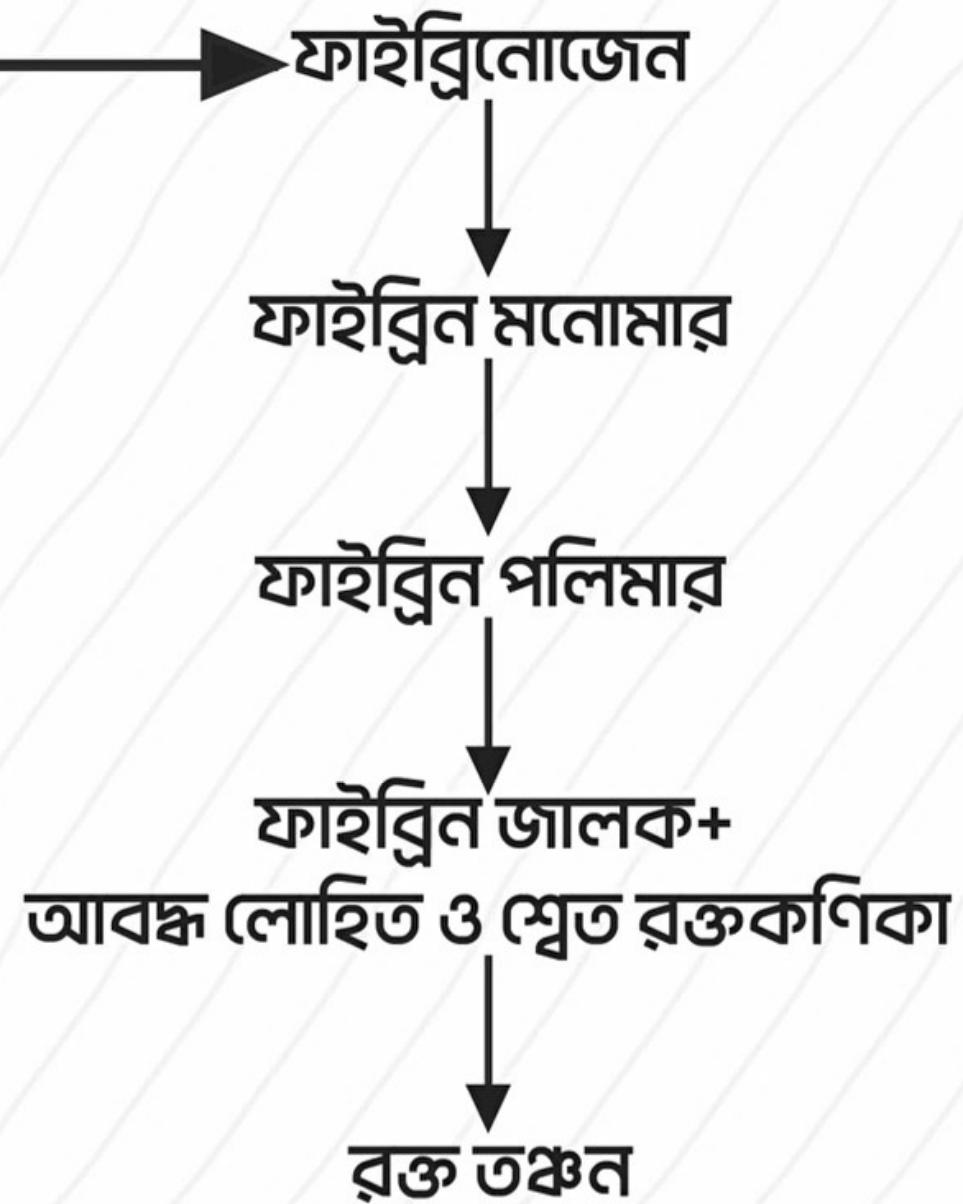
\*মানবদেহে রক্ত সংবহন \_\_\_\_\_

\*হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় \_\_\_\_\_

\*বুকে ব্যথা ও হার্ট অ্যাটাক \_\_\_\_\_

\*ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস  
ও এনজিওপ্লাষ্টি \_\_\_\_\_

| 1 | 1 |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 |   | 3 |
|   | 1 |   | 3 |
| 1 | 2 |   |   |
|   |   |   |   |
| 1 | 1 | 1 |   |
| 1 |   |   | 3 |
| 2 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |
| 1 |   |   |   |



## মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন

## Human Physiology : Blood & Circulation

রক্তবাহিকাসমূহ এবং হৎপিণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে।

ব্রিটিশ চিকিৎসক Willium Harvey 1928 খ্রিষ্টাব্দে মানুষের রক্ত সংবহন  
সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা দিয়েছেন।



## রক্ত (Blood)

রক্ত হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষাকারী এক বিশেষ তরল যোজক টিস্যু যার মাধ্যমে বিভিন্ন রক্তবাহিকা দেহের সকল কোষে পুষ্টি, ইলেক্ট্রোলাইট, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি,  $O_2$ , ইমিউন কোষ ইত্যাদি বহন করে এবং  $CO_2$  ও বর্জ্য পদার্থ প্রত্যাহত হয়।

একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে অর্থাৎ দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%।

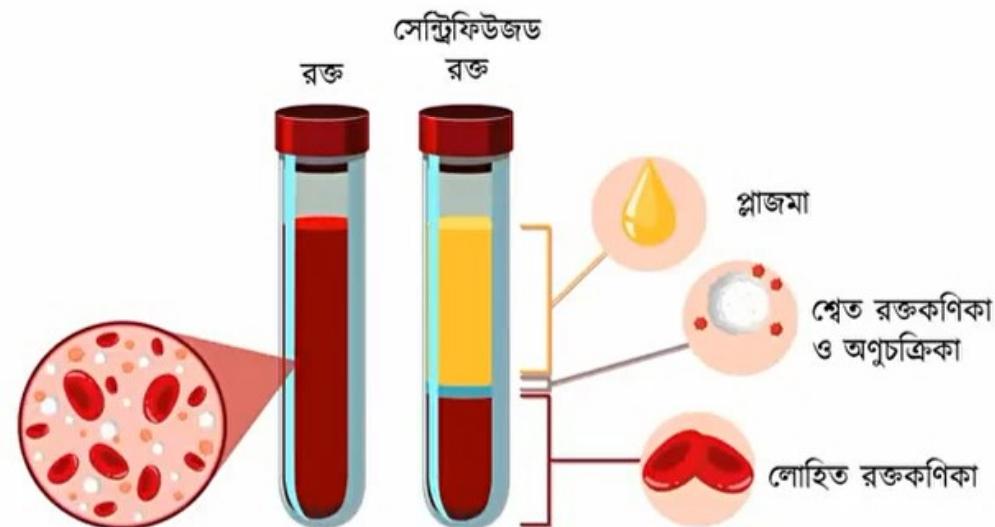
- রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। এর pH মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ (গড়ে ৭.৮০)।
- তাপমাত্রা  $36\text{-}38^{\circ}$  সেলসিয়াস।
- রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি, প্রায় ১.০৬৫।
- অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্তের স্বাদ নোনতা।
- সুনির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের সবখানে সঞ্চালিত হয়।

## রক্ত

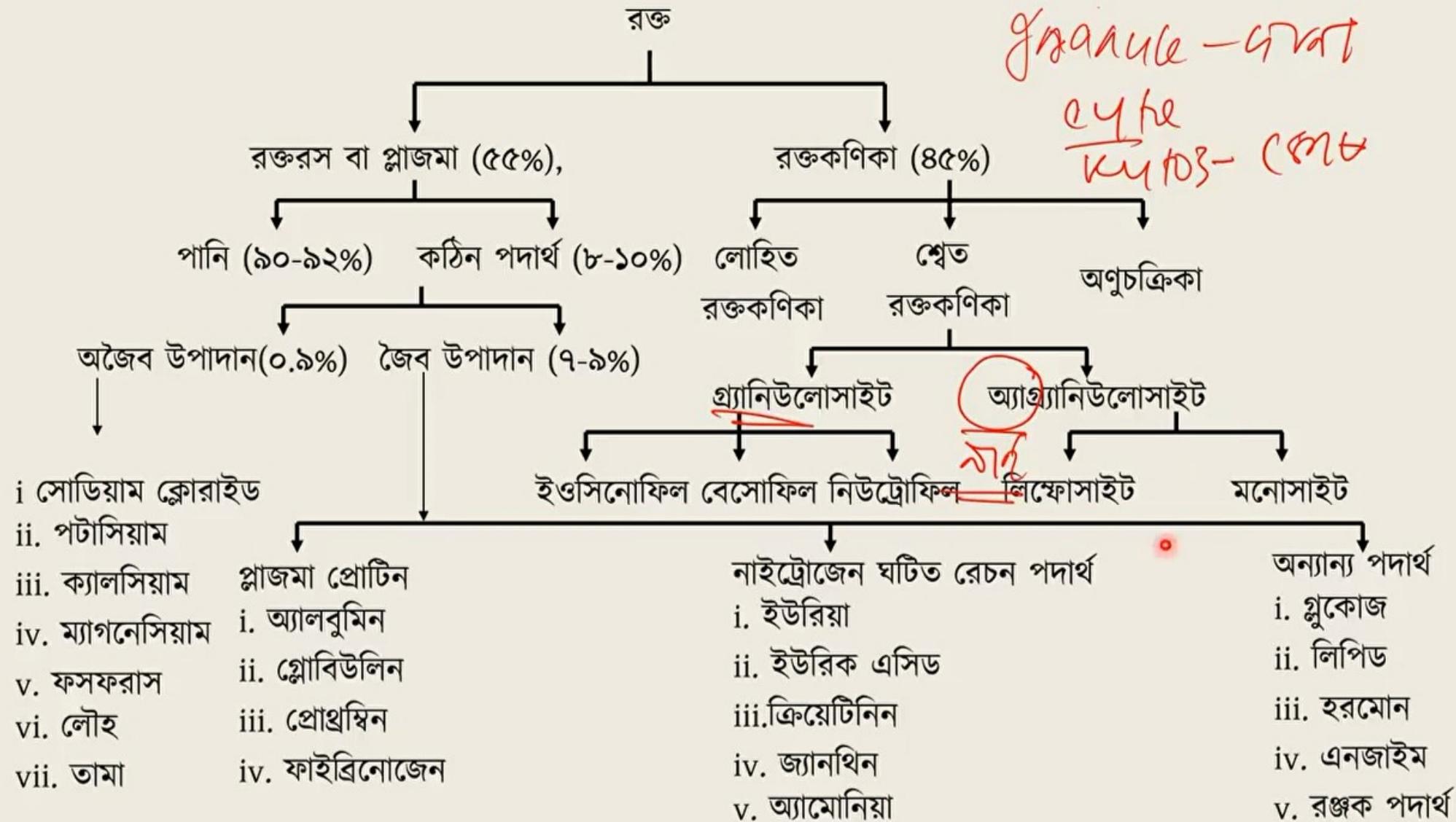
রক্তরস নামক তরল মাতৃকায় ভাসমান বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত টিস্যুকে রক্ত বলে।

### রক্তের উপাদান ( Components of Blood):

টেস্টটিউবে রক্ত নিয়ে সেন্ট্রিফিউজাল ঘন্টে (মিনিটে 3000 বার করে 30 বার) ঘুরালে রক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপরের হালকা হলুদ বর্ণের প্রায় 55% অংশের স্তরটি তা রক্তরস বা প্লাজমা (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি 45% অংশ রক্তকণিকা (blood Corpuscles)। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়।

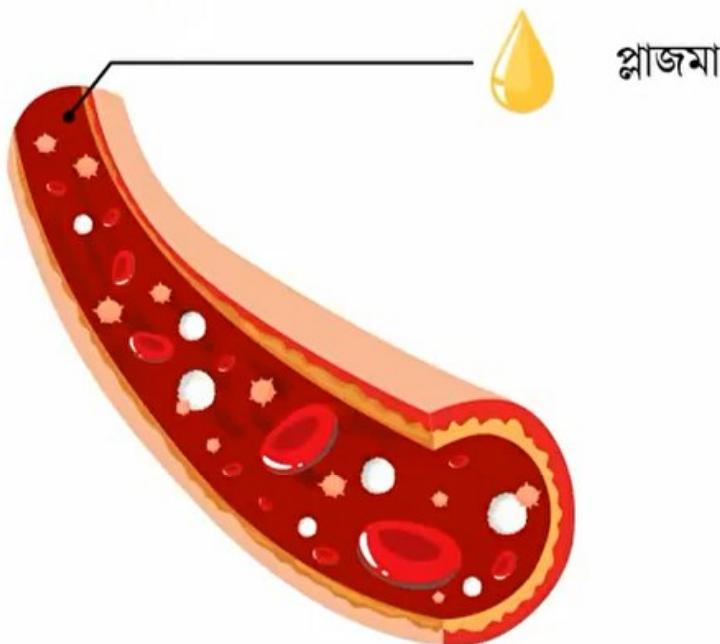


নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো



## রক্তরস

রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ।



### রক্তরসের কাজ :

- (i) রক্তের তারল্য রক্ষা করে এবং ভাসমান রক্ত কণিকাসহ অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ দেহের সর্বত্র বহন করে।
- (ii) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গে বাহিত হয়।
- (iii) টিস্যু থেকে নির্গত বর্জ্যপদার্থ রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়।
- (iv) টিস্যুর অধিকাংশ কার্বন -ডাইঅক্সাইড রক্তরসে বাইকার্বনেট রূপে দ্রবীভূত থাকে।
- (v) অল্প পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হয়।
- (vi) লোহিত কণিকায় সংবন্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়।
- (vii) রক্তরসের মাধ্যমে হরমোন, এনজাইন, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়।
- (viii) রক্তরস রক্তের অল্প-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

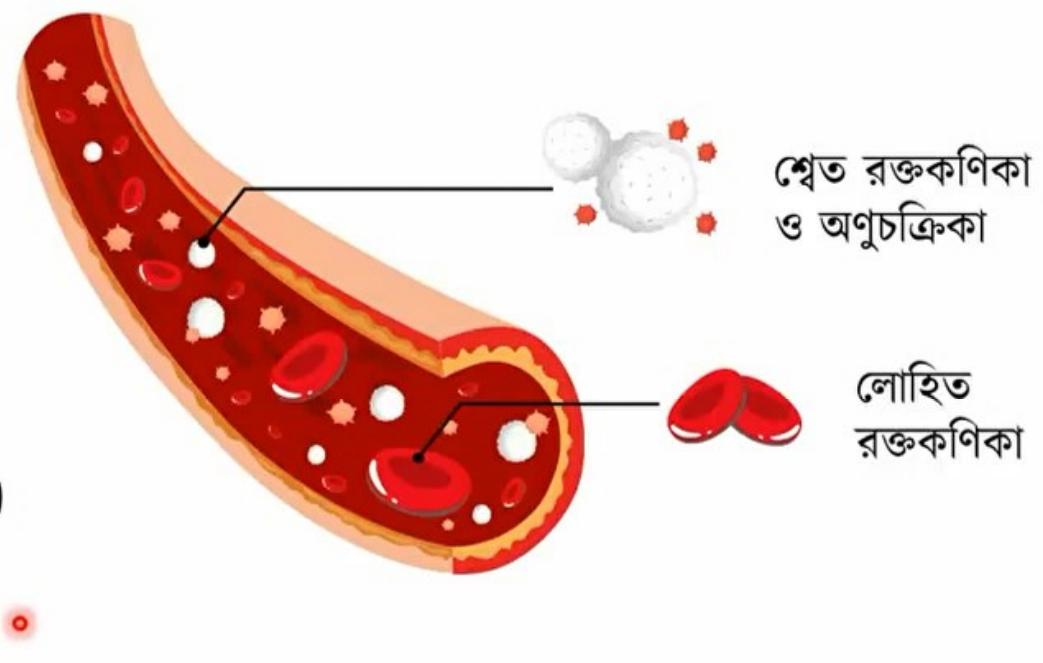
- (ix) রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে।
- (x) যকৃত, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে উৎপন্ন তাপ শক্তিকে সমগ্র দেহে বহন করে দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।

## রক্তকণিকা

রক্তের উপাদান হিসেবে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলে। এগুলো হিমাটোপয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। রক্তকণিকা তিনি ধরনের, যথা-  
 এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা,  
 লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা ও  
 প্লেইটলেট বা থ্রুম্বসাইট বা অণুচক্রিকা।

### (১) লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট

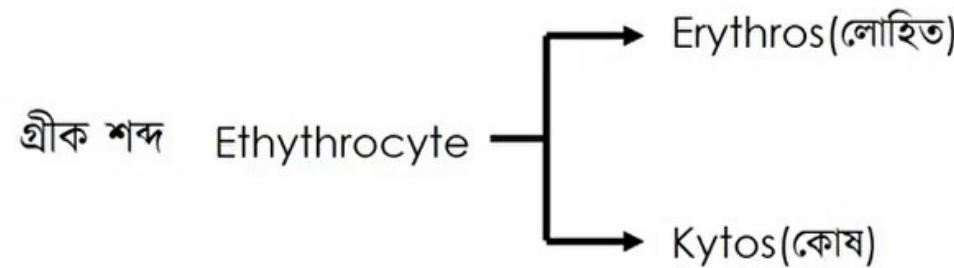
গ্রীক শব্দ Ethythrocyte → Erythros(লোহিত)  
 → Kytos(কোষ)



শ্বেত রক্তকণিকা  
 ও অণুচক্রিকা

লোহিত  
 রক্তকণিকা

## (১) লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট



বিভিন্ন বয়সের মানবদেহের প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছেঃ



জনদেহের : ৮০-৯০ লাখ



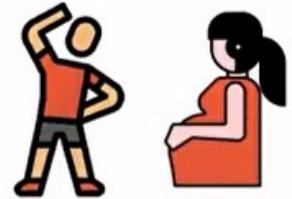
শিশু দেহের : ৬০ - ৭০ লাখ



পূর্ণবয়স্ক পুরুষ : ৫০ লাখ



পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে : ৪৫ লাখ

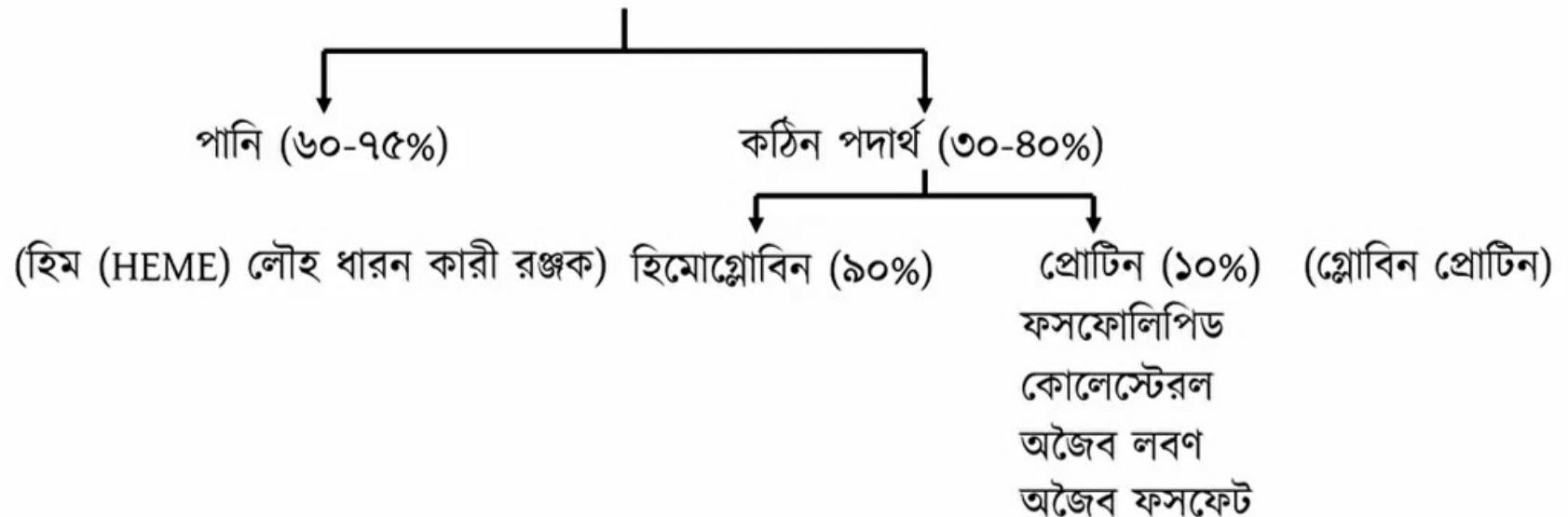


বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে। যেমন: ব্যায়ম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়।

- প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা ৫০ লাখের চেয়ে ২৫% কম হলে রক্তসন্ধাতা।
- কিন্তু এ সংখ্যা ৬৫ লাখের বেশি হলে তাকে পলিসাইথেমিয়া বলে।

### লোহিত রক্তকণিকার উপাদান সমূহঃ

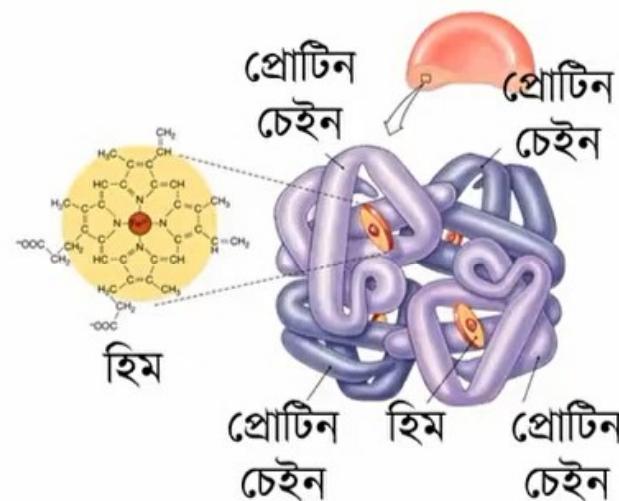
#### লোহিত রক্তকণিকা



## হিমোগ্লোবিন

১৬

- প্রতি ১০০ মিলিলিটারে রক্তে প্রায় ১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। ১৬ gm/dl
- হিমোগ্লোবিন ৪টি পলিপেপটাইড চেইনের সাথে একটি হিম গ্রুপ থাকে। হিম গ্রুপের জন্যই রক্ত লাল হয়



# লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্নের প্রক্রিয়া

রক্তে অক্সিজেন মাত্রা ↓



বৃক্ষ থেকে এরিথ্রোপয়েটিন হরমোন উৎপন্ন ক্ষরণ করে।



লাল অস্থিমঞ্জলায় মধ্যে স্টেমকোষ থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপন্ন হয়।



লোহিত রক্তকণিকার সহযোগিতায়  $O_2 \uparrow$



বৃক্ষ এরিথ্রোপয়েটিন ক্ষরণ ↓



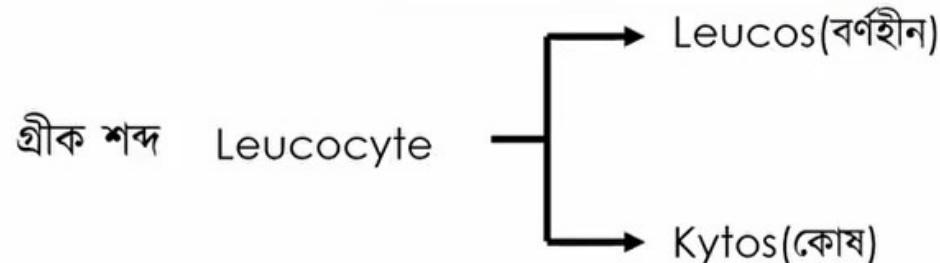
লোহিত রক্তকণিকার উৎপন্ন কর্ম ঘায় ↓



এরিথ্রোসাইট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে এরিথ্রোপয়েসিস বলে।

| রক্ত কণিকা         | সংখ্যা ( প্রতি<br>ঘন মিল<br>রক্তে) | উৎসস্থল  | গঠন প্রকৃতি  | কাজ  | আয়ু কাল | বাসস্থল       | ছবি   |
|--------------------|------------------------------------|--|--|--|----------|---------------|---|
| লোহিত<br>রক্তকণিকা | ৫০ লাখ                             | শ্বনবস্থায়<br>যকৃত ও প্লীহা<br>এবং জন্মের<br>পর লাল<br>অস্থিমজ্জা | গেলাকার, দ্বি -<br>অবতল, পূর্ণাঙ্গ<br>অবস্থায়<br>নিউক্লিয়াস<br>বিহীন,গড়<br>ব্যাস ৭.৩() ও<br>স্থুলতা ২.২() | ১. লোহিত<br>রক্তকণিকার<br>হিমোগ্লোবিন<br>ফুসফুস থেকে<br>দেহকোষে<br>অধিকাংশ $O_2$<br>এবং সামান্য<br>পরিমাণ<br>$CO_2$ পরিবহণ<br>করে।<br>২. রক্তের<br>ঘনত্ব ও<br>সান্দ্রতা ()<br>রক্ষা করে। | ১২০দিন   | যকৃত ও প্লীহা |  |

## শ্বেত রক্তকণিকা



### শ্বেত রক্তকণিকার বৈশিষ্ট্য :

- ১। মানবদেহ পরিণত শ্বেত রক্তকণিকা হিমোগ্লোবিন বিহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত
- ২। এগুলো ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করে।
- ৩। মানুষের শ্বেত রক্তকণিকা নির্দিষ্ট আকার বিহীন এবং প্রয়োজনে আকার পরিবর্তন করে।
- ৪। নিউক্লিয়াস প্রথমে গোল কণিকার হয় কিন্তু বয়েবৃদ্ধির সাথে সাথে বৃক্কাকার ও অশ্বক্ষুরাকার ধারণ করে, যা সাইটোপ্লাজমের চাপে এক প্রান্তে অবস্থান করে।
- ৫। গড় ব্যাস আকৃতির বিভিন্নতা অনুসারে  $7.50 - 20\mu m$  হয়

★ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে ৪-১১ হাজার (গড়ে ৭৫০০) শ্বেত রক্তকণিকা থাকে।

৬। শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াস সমৃদ্ধ এবং গ্লাইকোজেন,লিপিড, কোলেস্টেরল,এসিড ও বিভিন্ন প্রোটিওলাইটিক এনজাইম বহন করে।

★ শিশু ও অসুস্থ মানবদেহের শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়।



★ লোহিত রক্তকণিকা ও শ্বেত রক্তকণিকার অনুপাত ৭০০:১



আকৃতি ও গঠন গতভাবে শ্বেত রক্তকনিকা কে প্রধান দু ভাগে ভাগ করা যায় যথা

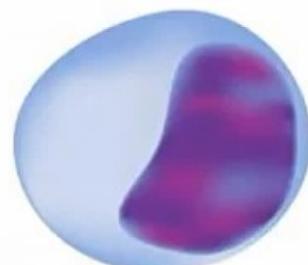
(ক) অদানাদার বা অগ্রানুলোসাইট এবং (খ) দানাদার বা গ্রানুলোসাইট

(ক) অদানাদারঃ

এ ধরনের লিউকোসাইট দানাহীন , অখন্দকায়িত ও বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত এবং আকৃতিগত ভাবে দু রকম :

(১) লিফোসাইট (lymphocyte)

(২) মনোসাইট (monocyte)



## (খ) দানাদার :

এসব কনিকার সাইটোপ্লাজম সুস্থ দানাময় এবং ২-৭ খন্দযুক্ত নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট।

ব্যাস  $12\text{-}15 \mu\text{m}$

দানাগুলো লিশম্যান রঞ্জকে নানাভাবে রঞ্জিত হয় বর্ণ ধারনের ক্ষমতার ভিত্তিতে গ্রান্যুলোসাইট তিনি ধারনের:

চৌধুরী

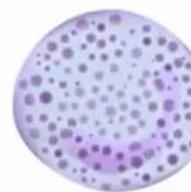
(১) নিউট্রোফিল (Neutrophil) সাইটোপ্লাজম বর্ণ নিরপেক্ষ দানাযুক্ত



(২) ইওসিনোফিল (Eosinophil): দানাগুলো ইওসিন রঞ্জকে লাল বর্ণ ধারন করে



(৩) বেসোফিল (Basophil): দানাগুলো ক্ষারাসক্ত হয়ে নীল বর্ণ ধারন করে



| রক্তকণিকা          |                   | সংখ্যা (প্রতি<br>ঘন মিমি রক্তে) | উৎসস্থল                                       | গঠন বৈশিষ্ট্য   | কাজ   | আয়ুক্ষাল |
|--------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------|
| শ্বেত<br>রক্তকণিকা | (১)<br>নিউট্রোফিল | ৩-৫ হাজার                       | লাল অস্থিমজ্জা                                | সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত,<br>নিউক্লিয়াস ২-৫ খন্ড বিশিষ্ট।<br>ব্যাস $12\mu m$ - $15\mu m$ .                        | ফ্যাগোসাইটোসিস<br>প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস<br>করে।   | ২-৫ দিন   |
|                    | (২)<br>ইওসিনোফিল  | ১৫০-৪০০                         | লাল অস্থিমজ্জা                                | সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত,<br>নিউক্লিয়াস ২-৭ খন্ড বিশিষ্ট।<br>ব্যাস $12\mu m$ - $17\mu m$                          | অ্যালার্জি প্রতিরোধে<br>সাহায্য করে।  | ৮-১২ দিন  |
|                    | (৩) বেসোফিল       | ০-১০০                           | লাল অস্থিমজ্জা                                | দানাযুক্ত সাইটোপ্লাজম<br>নিউক্লিয়াস বৃক্কাকার। ব্যাস<br>$12\mu m$ - $15\mu m$ .                                | হেপারিন ও হিস্টামিন<br>নিঃস্তৃত করে রক্তেকে<br>রক্ত বাহিকার ভিতর<br>জমাট বাঁধতে বাঁধা দেয়। | ১২-১৫ দিন |
|                    | (৪)<br>লিফেসাইট   | ১৫০০-২৭০০                       | প্লীহা, লসিকা গ্রন্থি,<br>লাল অস্থিমজ্জা      | দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম, প্রায়<br>গোলাকার, বৃহদাকার<br>নিউক্লিয়াস $6\mu m$ - $16\mu m$ .<br>Type equation here. | অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে।   | ৭ দিন     |
|                    | (৫)মনোসাইট        | ৩০০-৮০০                         | প্লীহা, লসিকা,<br>গ্রন্থি, লাল<br>অস্থিমজ্জা। | দানাবিহীন সাইটোপ্লাজম,<br>সবৃক্কাকার নিউক্লিয়াস $12\mu m$ -<br>$20\mu m$ .                                     | ফ্যাগোসাইটোসিস।<br>পদ্ধতিতে জীবাণু ধ্বংস<br>করে।  | ২-৫ দিন   |

## শ্বেত রক্তকণিকা

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে লিউকোসাইটোসিস (leukocytosis) এবং কম থাকলে তাকে লিউকোপেনিয়া (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। লিউকেমিয়া (leukemia) ক্যানসারের ক্ষেত্রে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

| রক্ত কণিকা | সংখ্যা ( প্রতি<br>ঘন মিলি<br>রক্তে) | উৎসস্থল  | গঠন প্রকৃতি  | কাজ  | আয়ু কাল | বাসস্থল                                       | ছবি   |
|------------|-------------------------------------|--|--|--|----------|---|---|
| অনুচক্রিকা | দেড় লক্ষ<br>থেকে তিন<br>লক্ষ       | লাল অঙ্গ<br>মজ্জার<br>মেগাক্যারিওসা<br>ইট নামক বড়<br>কোষ থেকে | গোল,<br>ডিশ্বাকার বা<br>রডের মত<br>দানাময় কিন্তু<br>নিউক্লিয়াস<br>বিহীন $1 \mu m$<br>- $8 \mu m$<br>ব্যাসবিশিষ্ট | (১) অঙ্গায়ী<br>প্লোইলেট প্লাগ<br>সৃষ্টির মাধ্যমে<br>রক্তপাত বন্ধ<br>করে।<br><br>(২) রক্ত জমাট<br>ত্বরান্বিত<br>করতে বিভিন্ন<br>ক্লাটিং ফ্যাক্টর<br>(clouting<br>factor) ক্ষরণ<br>করে। | ৫-৯ দিন  | যকৃত ও<br>প্লীহার<br>ম্যাক্রোফেজের<br>মাধ্যমে |  |

- (৩) প্রয়োজন শেষে রক্ত  
জমাট বিগলনে সাহায্য করে।  
(৪) ফ্যাগোসাইটেসিস  
প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়াও  
ভাইরাস ধংস করে।  
(৫) দেহের কোথাও ব্যাথা  
সৃষ্টি হলে নিউট্রোফিল ও  
মনোসাইটকে আকৃষ্ট করতে  
রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ  
করে।  
(৬) রক্ত বাহিকার  
এডোথেলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীর  
সুরাক্ষার জন্য গ্রোথ ফ্যাস্ট্রি  
ক্ষরণ করে।  
(৭) সেরোটোনিন নামক  
রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে  
রক্তপাত বর্জের উদ্দেশ্যে রক্ত  
বাহিকাকে দ্রুত সংকোচনে  
উদ্বৃদ্ধ করে।

লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অগুচ্ছিকার মধ্যে পার্থক্য।

| তুলনীয় বিষয় | লোহিত রক্তকণিকা  | শ্বেত রক্তকণিকা                                      | অগুচ্ছিকা   |
|---------------|--|--|---|
| সংখ্যা        | ১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৫০ লক্ষ।  | ১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫-৮ হাজার।           | ১. প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ১.৫ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ। |
| নিউক্লিয়াস   | ২. প্রাথমিকভাবে নিউক্লিয়াস থাকলেও হিমোগ্লোবিন সঞ্চিত হ্বার পর নিউক্লিয়াস বিনষ্ট হয়ে যায়। | ২. সব সময় নিউক্লিয়াস থাকে।                         | ২. কোন সময়ই নিউক্লিয়াস থাকে না।                     |
| বর্ণ          | ৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন এগুলোকে লাল বর্ণের দেখায়।                                       | ৩. সাইটোপ্লাজমে হিমোগ্লোবিন না থাকায় এগুলো বর্ণহীন। | ৩. বর্ণহীন।   |
| আয়ুক্ষাল     | ৪. ১২০ দিন   | ৪. ২-১৫ দিন।   | ৪. ৫-৯ দিন।   |
| আকৃতি         | ৫. দ্বি-অবতল, চাকতির মতো।  | ৫. গোলাকার বা অনিয়ত।                                | ৫. অনিয়ত আকৃতির।                                     |
| কাজ           | ৬. $O_2$ পরিবহন।   | ৬. রোগ প্রতিরোধ।                                     | ৬. রক্ত তৎপৰ।   |

## রক্ত তপ্তন

মানবদেহে রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা কারণ বাহিকার অন্তঃস্থ প্রাচীর থাকে মসৃণ এবং রক্তে **হেপারিন (heparin)** নামে এক ধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইডের সংবহন। **দেহের কোথাও ক্ষত সৃষ্টির ফলে কোনো রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ও সংক্রমণ প্রতিরোধে যে জটিল জৈব রাসায়নিক, প্রক্রিয়ায় ফাইব্রিন জালক সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতস্থানে রক্তকে থকথকে পিণ্ডে পরিণত করে সে প্রক্রিয়াকে রক্তের জমা বাঁধা বা রক্ত তপ্তন বলে। এ প্রক্রিয়ায় অগুচ্ছকা ও রক্তরসে অবস্থিত ১৩ ধরনের **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factors) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো- (১) ফাইব্রিনোজেন, (২) প্রথম্বিন, (৩) থ্রোপ্লাস্টিন ও (৪)  $Ca^{2+}$ ।**

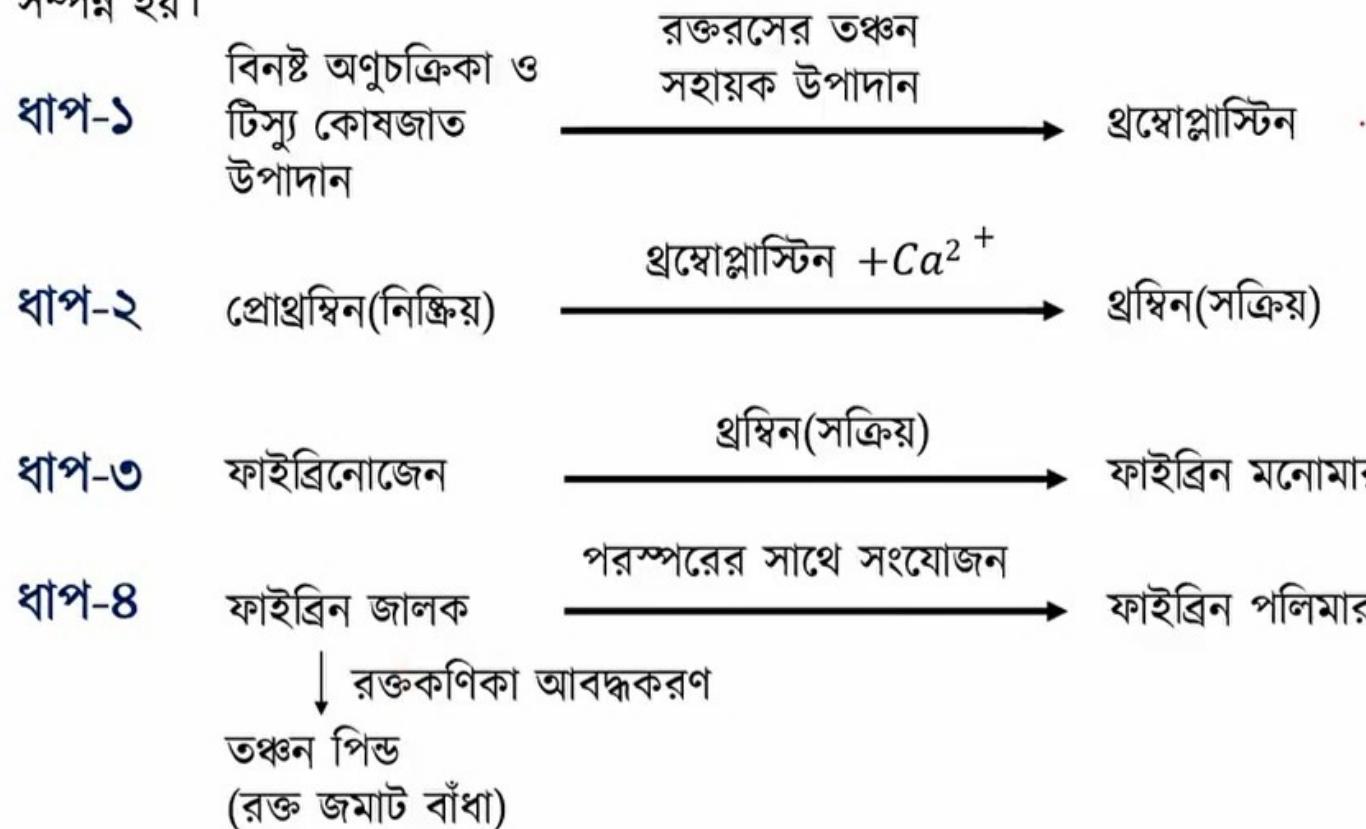
## নিচে ফ্যাট্টগুলোর নাম ও রক্ত তৎপরে ভূমিকা উল্লেখ করা হলো

| ফ্যাট্ট  | তৎপরে ভূমিকা  |
|--|---|
| ১. ফ্যাট্ট-I বা ফাইব্রিনোজেন                         | এটি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। তৎপরের সময় ফাইব্রিনে পরিণত হয়।   |
| ২. ফ্যাট্ট -II বা প্রোথ্রিস্টিন                      | এটি প্লাজমা প্রোটিন ও ভিটামিন K-র উপস্থিতিতে যকৃতে সংশোধিত হয়। তৎপরের সময় থ্রিস্টিনে পরিণত হয়।                               |
| ৩. ফ্যাট্ট-III বা থ্রুম্বোপ্লাস্টিন                  | এটি বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা ভাঙা অণুচক্রিকা থেকে নিঃসৃত হয়। এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহায়তায় প্রোথ্রিস্টিনকে থ্রিস্টিনে পরিণত করে। |
| ৪. ফ্যাট্ট-IV বা ক্যালসিয়াম                         | ক্যালসিয়াম আয়ন একাধারে থ্রুম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে এবং অপর- দিকে প্রোথ্রিস্টিনকে থ্রিস্টিনে পরিণত করে।              |
| ৫. ফ্যাট্ট-V বা ল্যাবাইল ফ্যাট্ট বা প্রোঅ্যাকসেলারিন | প্লাজমায় অবস্থিত প্রোটিন জাতীয় এ পদার্থটি প্রোথ্রিস্টিনকে থ্রিস্টিনে পরিণত করে।   |
| ৬. ফ্যাট্ট-VI বা অ্যাকসেলারিন                        | এটি প্রকল্পিত।  |
| ৭. ফ্যাট্ট-VII বা স্টেবল ফ্যাট্ট বা প্রোকনভারটিন     | প্লাজমায় অবস্থিত এ প্রোটিনটি থ্রুম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।  |

|   |   |
|---|---|
| ৮. ফ্যাক্টর-VIII বা<br>অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (AHF) | এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রুম্বোপ্লাস্টিন সৃষ্টিতে সাহায্য করে।  |
| ৯. ফ্যাক্টর-IX বা ক্রিসমাস ফ্যাক্টর                     | এটি প্লাজমায় থাকে এবং থ্রুম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদনে সাহায্য করে।   |
| ১০. ফ্যাক্টর- X বা স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর                  | এর রাসায়নিক উপাদান ফ্যাক্টর -VII এর মতো। এর অভাবে রক্ত তৎপন ব্যাহত হয়।  |
| ১১. ফ্যাক্টর- XI বা প্লাজমা<br>থ্রুম্বোপ্লাস্টিন        | রক্তরসে অবস্থিত প্রোটিন, থ্রুম্বোপ্লাস্টিন গঠনে অংশ নেয়।   |
| ১২. ফ্যাক্টর-XII বা হ্যাগম্যান<br>ফ্যাক্টর              | রক্তরসে অবস্থিত এ ফ্যাক্টর ক্যালিক্রেইনকে (Kallikrein) সক্রিয় করে এবং প্লাজমাকাইনিন (Plasmakinin) নামক পদার্থ সৃষ্টি করে রক্তনালির ভেদ্যতা ও সমপ্রসারণশীলতা বাড়ায়। |
| ১৩. ফ্যাক্টর-XIII বা ফাইব্রিন                           | এটি ক্যালসিয়াম আয়নের সহযোগিতায় রক্তের নরম তৎপন পিণ্ডকে অদ্রবণীয় স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর কঠিন তন্ত্রে রূপান্তরিত করে।  |

# রক্ত তঞ্চন পদ্ধতি (Mechanism of Blood Clotting)

ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশে যে কোনো উপায়ে রক্তপাত মন্ত্র ও বন্ধের প্রক্রিয়াকে হিমোস্টেসিস (hemostasis) বলে। মানবদেহে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটি হিমোটেসিসের অংশ নিচে বর্ণিত কয়েকটি ধারাবাহিক জৈব রাসায়নিক ধাপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।



রক্ততঞ্চকালঃ দেহ থেকে নির্গত রক্ত জমাট বাধতে যে সময় লাগে তাকে রক্ততঞ্চকাল বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্ততঞ্চকাল হচ্ছে ৩-৮ মিনিট।

তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সময় আরও বেশি লাগতে পারে।

### রক্তক্ষরণকালঃ

কোন বাহ্যিক প্রয়োগ ছাড়া প্রথম রক্ত নির্গত হওয়া থেকে রক্ত জমাট বাধা পর্যন্ত সময়কে রক্তক্ষরণকাল বলে।

মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ কাল হচ্ছে ১-৪ মিনিট।

**রক্ত তঞ্চনের তাৎপর্য (Significance of Blood Clotting) :** দেহের কোনো অংশের রক্তবাহিকা কেটে গেলে সেখান থেকে রক্তপাত হতে থাকে এবং সংবহনতন্ত্রে রক্তের আয়তন কমে যায়। রক্ত প্রাণিদেহে খাদ্যবস্তুর সরবরাহ, গ্যাসীয় বস্তুর পরিবহন, রেচন বস্তুর অপসারণ, হরমোন বহন এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই দেহে রক্তের পরিমাণ কমে গেলে নানারকম শারীরবৃত্তীয় সমস্যা দেখা দেয়, এমনকি প্রাণীর মৃত্যুও হতে পারে। রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়া ছিন্ন রক্তবাহিকা থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে সেই সব সম্ভাবনা রোধ করে।

**রক্তনালির ভিতরে সাধারণত রক্ত তঞ্চন হয় না। কারণ-** রক্ত অমসৃণ তল বা বিনষ্ট টিস্যুকোষ বা বাতাসের সংস্পর্শে এলে রক্তের অণুচক্রিকা ভেঙে থ্রোপ্লাস্টিন তৈরি হয়, ফলে রক্ত তঞ্চনের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু রক্তনালির অন্তর্গাত্র মসৃণ হওয়ায় এবং রক্ত বাতাসের সংস্পর্শে না আসায় অণুচক্রিকা থেকে থ্রোপ্লাস্টিন উৎপন্ন হয় না, ফলে রক্ত তঞ্চনের সূত্রপাতও ঘটে না। রক্তনালির ভিতর রক্তের গতি রক্ত তঞ্চনের সহায়ক নয়।

রক্তে হেপারিন নামক একধরনের তঞ্চন নিরোধক পদার্থ বা অ্যান্টিকোয়াগ্যুল্যান্ট (anticoagulant) থাকে। হেপারিন রক্তের বেসোফিল ও যোজক টিস্যুর মাস্ট কোষ থেকে নিঃসৃত হয়। হেপারিন প্রাথমিক থেকে থ্রুম্বিনের উৎপাদনে বাধা দিয়ে রক্ত তঞ্চন

## প্লাজমা ও সিরামের মধ্যে পার্থক্য

| প্লাজমা (plasma)                                | সিরাম (Serum)   |
|---|---|
| ১. স্বাভাবিক রক্তের জলীয় অংশকে প্লাজমা বলে।    | ১. তথিগত রক্তের তৎওন পিণ্ড থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশকে সিরাম বলে। |
| ২. এতে বিভিন্ন প্রকার রক্ত কনিকা থাকে।          | ২. এতে রক্ত কনিকা থাকে।                                       |
| ৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে।                       | ৩. এতে ফাইব্রিনোজেন থাকে না।                                  |
| ৪. এর তৎওন ধর্ম উপস্থিত।                        | ৪. এর তৎওন ধর্ম অনুপস্থিত।                                    |
| ৫. রক্তবাহিকার গহ্বর ও হৎপ্রকোষ্ঠে অবস্থান করে। | ৫. সাধারণ অবস্থায় দেহের মধ্যে থাকে না।                       |

## লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

টিস্যু গঠনকারী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বণহীন তরল পদার্থকে **লসিকা (lymph; ল্যাটিন clear water)** বলে। পরিণত মানব দেহে প্রতিদিন কৈশিক জালিকার প্রাচীর ভেদ করে ৪-৮ লিটার তরল পদার্থ ও রক্তপ্রোটিন চারপাশের টিস্যু কোষের ফাঁকে ফাঁকে লসিকা হিসেবে অবস্থান করে।

**লসিকার উৎপত্তি :** ধমনির শাখা থেকে উৎপন্ন কৈশিক ধমনিতে রক্ত পৌছালে এর অধিকাংশই কৈশিক শিরাতে প্রবাহিত হয়। প্রায় ১০% এর মতো রক্তরস (প্লাজমা) কৈশিকজালিকা থেকে বেরিয়ে দেহ কোষের চারদিকে ইন্টারস্টিশিয়াল তরল (interstitial fluid) হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকানালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে লিম্ফোজেনেসিস (lymphogenesis) বলে।

**লসিকার উপাদানঃ** লসিকায় প্রধানত দুধরনের উপাদান দেখা যায়, যথা-কোষ উপাদান ও কোষবিহীন উপাদান।

**কোষ উপাদানঃ** লসিকায় প্রধানত শ্বেত কণিকার লিম্ফোসাইট থাকে। সামান্য পরিমাণ লোহিত কণিকা দেখা গেলেও (কৈশিক জালিকার পাতলা প্রাচীর ভেদ করে ইন্টারস্টিশিয়াল তরলে প্রবেশ করে) অগুচ্ছিকা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার লসিকায় ৫০০ - ৭৫,০০০ লিম্ফোসাইট থাকতে পারে।)

## কোষবিহীন উপাদান :

লসিকায় অবস্থিত কোষবিহীন উপাদানগুলো রক্তরসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

লসিকায় প্রায় ৯৪% পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ বিদ্যমান।

কঠিন অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পাওয়া যায়।

**১. শর্করা :** প্রতি ১০০ মিলিমিটার লসিকায় শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ ১২০-১৩২ গ্রাম।

**২. প্রোটিন :** লসিকায় প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি থাকে।

**৩. লিপিড :** প্রধানত ফাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফলিপিড উপস্থিত।

অভুক্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে।

চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল (chyle)** বলে। তবে সাধারণত এর পরিমাণ মোট কঠিন অংশের প্রায় ৫-১৫%।

**৪. রেচন বর্জ্য :** লসিকায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

**৫. অন্যান্য বস্তু :** গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যান্সার কোষ, দ্রবীভূত  $\text{CO}_2$  ইত্যাদিও লসিকায় পাওয়া যায়।

# লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system)

লসিকানালি ও লসিকা গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে সমগ্র দেহে লসিকা রস প্রবাহিত হয় তাকে লসিকাতন্ত্র বলে।

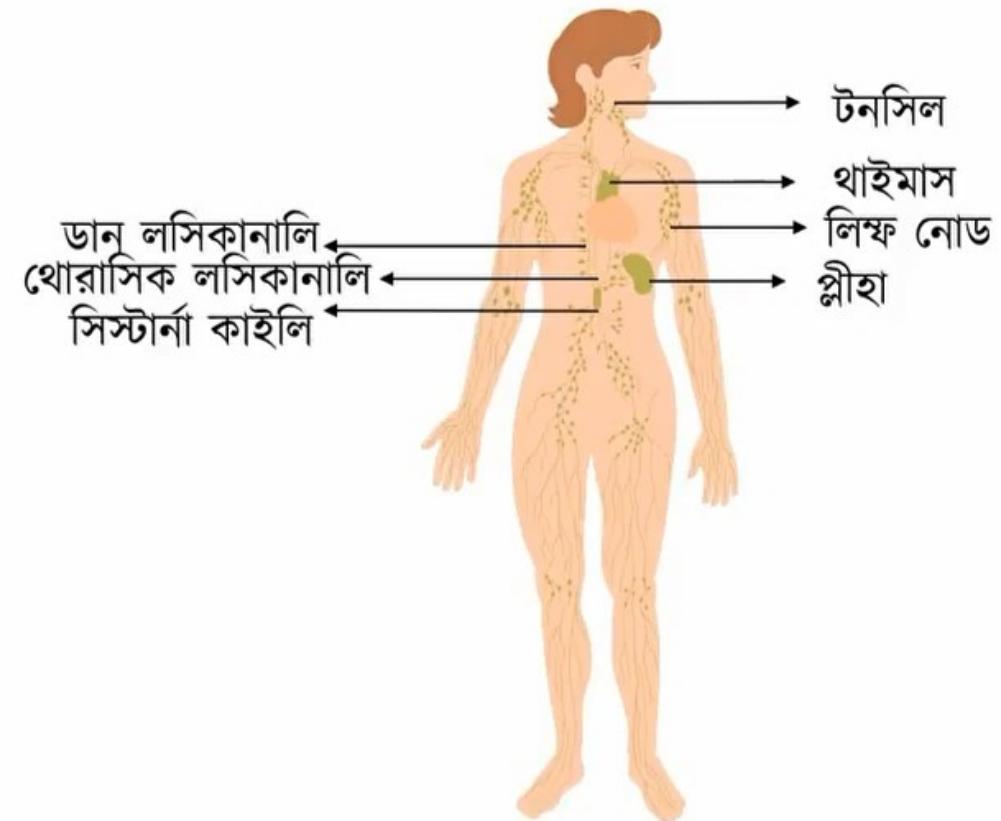
ডেনিস বিজ্ঞানী Olaus Rudbeck এবং Thomas Bartholin, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম মানুষের লসিকাতন্ত্রের বিবরণ দেন।  
রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং লসিকাতন্ত্র উভয়ই সমগ্র দেহে ফ্লুইড (fluid) সংবহন করে বলে লসিকাতন্ত্রকে কখনো কখনো **দ্বিতীয়**  
সংবহনতন্ত্র বলেও অভিহিত করা হয়।



Olaus Rudbeck



Thomas Bartholin



# লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system)

লসিকাতন্ত্র প্রধান দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা- লসিকা নালি ও লসিকা গ্রন্থি।

## লসিকা নালি (Lymph vessel)

লসিকা নালি বন্ধপ্রাণ্ডিশিষ্ট সূক্ষ্ম নালিকা। লসিকা নালি দুধরনের, যথা-

১. অন্তর্মুখী লসিকানালি : এসব নালির মাধ্যমে লসিকা লসিকাগ্রন্থির দিকে পরিবাহিত হয়।

২. বহিমুখী লসিকানালি : এসব লসিকানালির মাধ্যমে লসিকাগ্রন্থি থেকে লসিকা রস অন্যত্র পরিবাহিত হয়।

মানুষের দেহের সকল লসিকানালি প্রধানত দুটি নালিতে মিলিত হয়। যথা:-

ডান লসিকানালি : মাথা ও গলার ডান দিক, ডান বাহু এবং বক্ষ অঞ্চলের ডান দিকে অবস্থিত লসিকানালিগুলো মিলে ডান লসিকানালি গঠন করে। এটি ডান সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং ডান অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত।

থোরাসিক লসিকানালি : দেহের নিম্নাংশ এবং বাম দিকের লসিকানালিগুলো মিলে থোরাসিক লসিকানালি গঠন করে।

এটি বাম সাবক্লেভিয়ান ও বাম অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত।

পৌষ্টিকনালি অঞ্চলে লসিকানালি সুবিকশিত এবং নালি অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম লসিকানালিকে ল্যাকটিয়েল (lacteal) বলে।

লসিকানালিতে শিরার অনুরূপ কপাটিকা থাকে তবে সংখ্যায় বেশি। ফলে লসিকা শুধু এক দিকে প্রবাহিত হয়।

চলন বা শ্বসনের সময় কক্ষাল শেশির সংকোচনে লসিকানালিতে অত্যন্ত ধীর গতিতে লসিকা প্রবাহিত হয়।

লসিকানালিতে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা কোষের ধ্বংসাবশেষ (cell debris) প্রবেশ করতে পারে।

## লসিকা গ্রান্টি (Lymph gland)

লসিকানালিতে কিছুটা পর পর গোলাকার বা বৃক্ষাকার স্ফীত অংশ থাকে। এদের লসিকা গ্রান্টি বা লিম্ফনোড বা লিফ গ্ল্যান্ড বলে।

প্লীহা (spleen), টন্সিল (tonsil), অস্থিমজ্জা (bone marrow), থাইমাস (thymas) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লসিকা গ্রান্টি।

- মানবদেহে ঘাড়ে, বগলে, কুচকিতে অধিক সংখ্যক লসিকা গ্রান্টি থাকে।
- মানবদেহে লসিকা গ্রান্টির সংখ্যা প্রায় ৪০০-৭০০।
- লসিকা গ্রান্টি যান্ত্রিক ফিল্টার হিসেবে কাজ করে লসিকায় অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও ক্ষতিকর কোষের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

এছাড়াও লিম্ফোসাইট উৎপাদন, ব্যাকটেরিয়া অপসারণ, অ্যান্টিবডি উৎপাদন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ লসিকা গ্রান্টি করে থাকে।

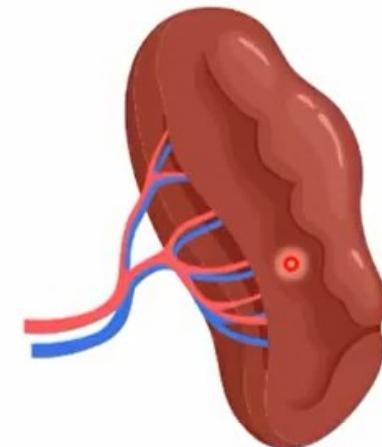


# লসিকা গ্রান্ডি (Lymph gland)

নিচে দুটি প্রধান লসিকা গ্রান্ডির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

**প্লীহা (Spleen) :** প্লীহা মানবদেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রান্ডি।

- দেহতরলের ভারসাম্য রক্ষায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।
- প্লীহা পাঁজরের নিচে এবং পাকস্থলির উপরে, উদরের বাম উর্ধ্ব প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে।
- পরিণত মানুষের প্লীহা প্রায় ৫ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট এবং ওজনে প্রায় ১৫০ গ্রাম।
- কালচে বর্ণের নরম প্লীহাকে রক্তের রিজার্ভার বা ব্লাড ব্যাংক বলা হয় এবং এটি প্রায় ৩০০ মিলিলিটার রক্ত জমা রাখে।
- প্লীহা রক্তের প্রধান ছাঁকুনি হিসেবে কাজ করে।
- অধিকাংশ লোহিত রক্তকণিকা প্লীহায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
- এটি জীবাণু ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধে অংশ গ্রহণ করে।



## লসিকা গ্রান্থি (Lymph gland)

**টনসিল (Tonsil) :** মুখ হা করলে গলার ভিতরে ডান ও বাম দিকে ছোট বলের মতো যে গঠন দেখা যায় তার নাম টনসিল।

টনসিল এক ধরনের লসিকা গ্রান্থি। এরা জীবাণু আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রথম সারির প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

- এর প্রচুর পরিমাণে লিফ্ফোসাইট সৃষ্টি করে যারা মুখে প্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে গড়ে তোলে।
- তবে অনেকসময় টনসিল নিজে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ফুলে যায়।  
একে টনসিলাইটিস (tonsillitis) বা টনসিলের প্রদাহ বলে।
- মানুষ ফাইলেরিয়া কৃমি (*Wuchereria bancrofti*) দ্বারা আক্রান্ত হলে লসিকানালি ও লসিকা গ্রান্থিগুলোতে লসিকা প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হয়।
- ফলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের লসিকানালি ও গ্রান্থিগুলো অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যায়।  
এরোগকে গোদ রোগ বা এলিফ্যান্টিয়াসিস (elephantiasis) বলে।



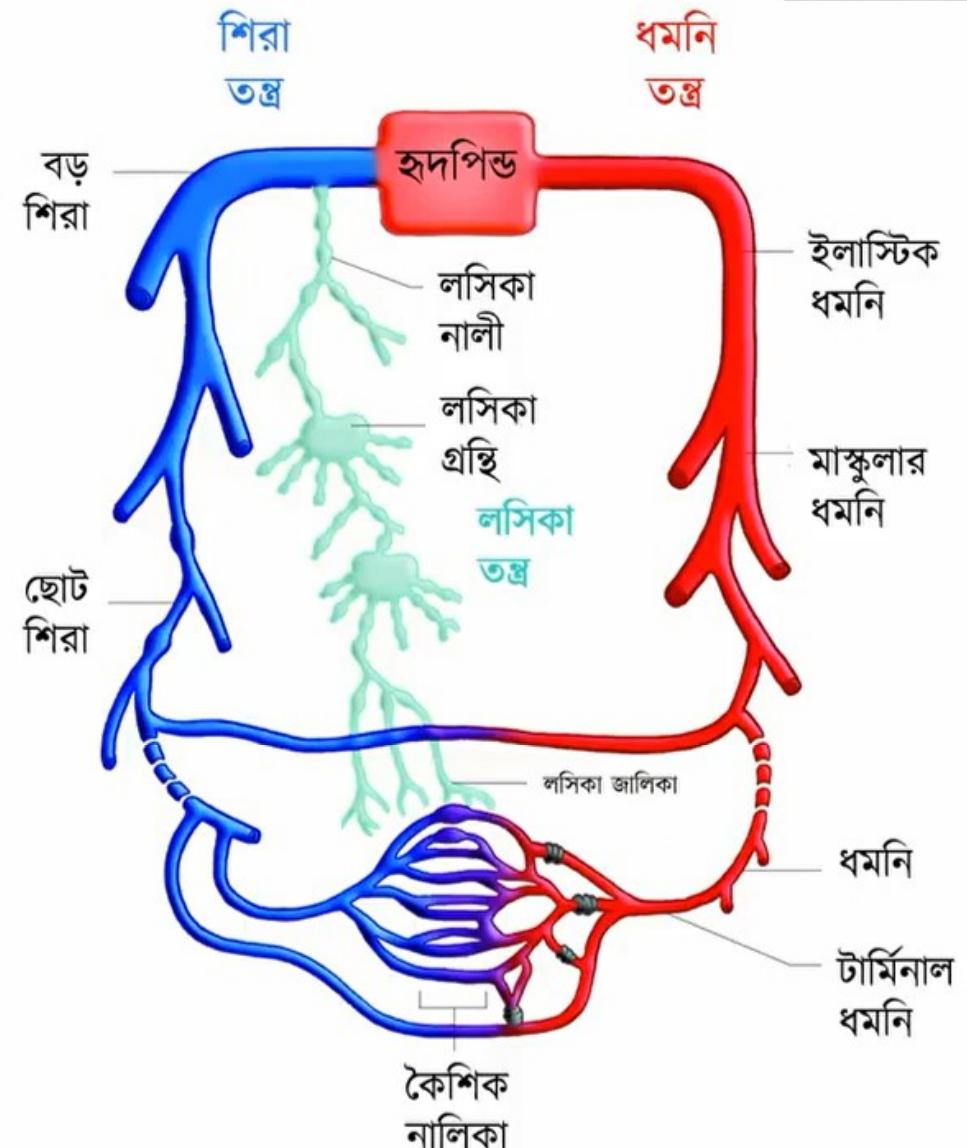
## • লসিকা সংবহন (Circulation of lymph)

লসিকা রক্তের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে কোষের আন্তঃকোষীয় স্থানে আসে।

সেখান থেকে লসিকাজালকে প্রবেশ করে।

লসিকাজালক থেকে লসিকানালিতে এবং সেখান থেকে থোরাসিক লসিকা নালি ও ডান লসিকা নালিতে প্রবেশ করে।

এই নালি থেকে লসিকা সাবক্লেভিয়ান শিরার মাধ্যমে রক্তে ফিরে যায়।



## লসিকার কাজ

দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন-

১. টিস্যুর ফাঁকা স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।
২. যেসব ম্লেহকণা ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কণা কৈশিক নালির বাধা অতিক্রমে অক্ষম সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩. দেহের যেসব টিস্যুকোষে রক্ত পৌছাতে সক্ষম হয় না সেখানে লসিকা অক্সিজেন ও পৃষ্ঠি উপাদান সরবরাহ করে।
৪. অন্ত থেকে মেহ পদার্থ শোষিত হয়ে লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৫. লসিকায় উপস্থিত শ্বেত কণিকা (লিফ্ফোসাইট ও মনোসাইট) দেহের প্রতিরক্ষায় অবদান রাখে।
৬. লসিকা ও লিফ্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়।
৭. লসিকা রক্ত সংবহনের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থ পরিবহনের মাধ্যমে দেহরসের পুনর্বন্টনে অংশ নেয়।
৮. বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর সাংগঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় লসিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৯. টিস্যু থেকে টিস্যুরসের প্রায় ১০% অংশ লসিকার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

## রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য

| বৈশিষ্ট্য          | রক্ত   | লসিকা   |
|--------------------|--|---|
| ১. বর্ণ            | লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু।  | বণহীন <b>পরিবহন টিস্যু</b> ।                                  |
| ২. প্রবাহ          | রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।                            | লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।                              |
| ৩. গঠন উপাদান      | প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অগুচক্রিকা নিয়ে গঠিত। | প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।                         |
| ৪. হিমোগ্লোবিন     | হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান   | হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।  |
| ৫. প্রোটিন ইত্যাদি | অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।                      | অল্ল পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।               |
| ৬. পরিবহন          | রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যসার (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।  | লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়। |

## মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে হৃৎপিণ্ড বলে।

রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানবদেহের পাম্পিং মশিন (pumping machine) রূপে কাজ করে। একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্ধায় হৃৎপিণ্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়।

প্রাণ্ড বয়স্ক পুরুষে হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৫০-৩৯০ গ্রাম ও স্ত্রীতে ২০০-২৭৫ গ্রাম।

জ্বণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে ছয় সপ্তাহ থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং আমৃতু এ স্পন্দন চলতে থাকে।

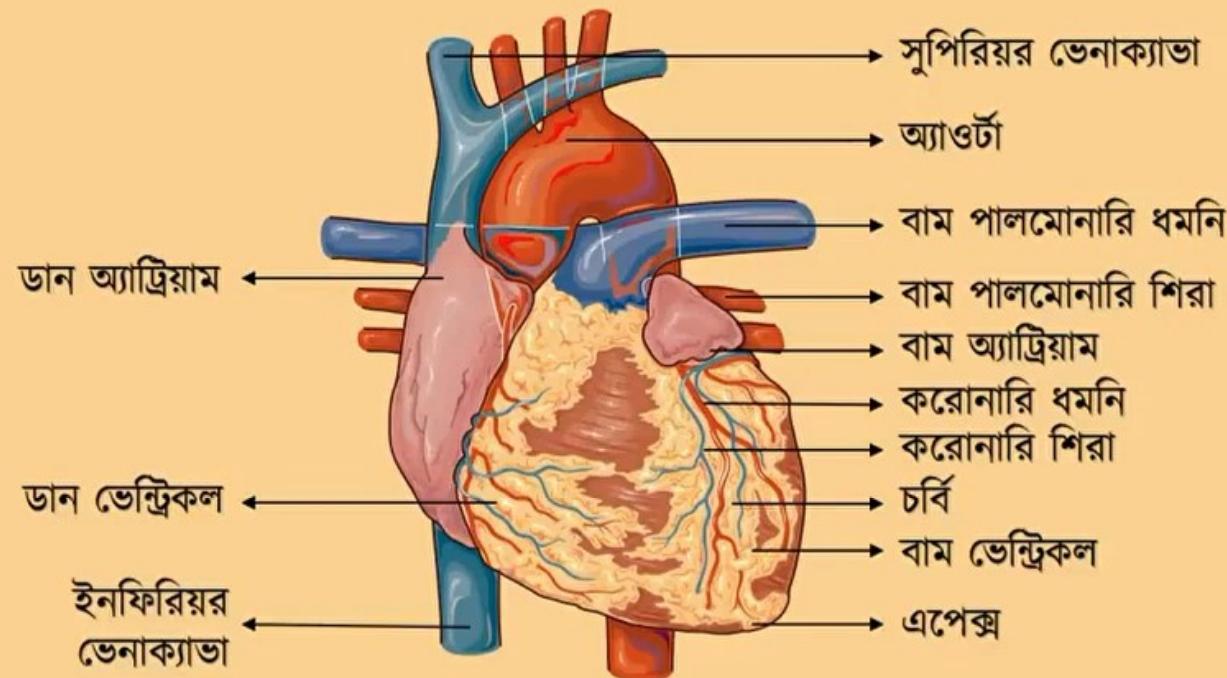
**অবস্থান :** মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত।

এটি দেখতে ত্রিকোণাকার; গোড়টি চওড়া ও উর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুচালো শীর্ষদেশ নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে অবস্থান করে।

**আকার ও আকৃতি :** লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো।

এর চওড়া উর্ধ্বমুখী অংশটি বেস (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি এপেক্স (apex)।

একজন প্রাণ্ড বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ প্রায় ৮ সেন্টিমিটার।



মানব  
হৃৎপিণ্ডের গঠন

## মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

আবরণ : হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। এর নাম পেরিকার্ডিয়াম (pericardium)।

পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক তন্ত্ময় পেরিকার্ডিয়াম (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক সেরাস পেরিকার্ডিয়াম (serous pericardium) নামে পরিচিত।

সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, বাইরের দিকে প্যারাইটাল স্তর (parietal layer) এবং ভিতরের দিকে ভিসেরাল স্তর (visceral layer)।

প্যারাইটাল ও ভিসেরাল স্তরদুটির মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফুইড (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে।

এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

**প্রাচীর (Wall) :** হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত।

এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে কার্ডিয়াক পেশি (cardiac muscles) বলে।

পেশি ও যোজক টিস্যু তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তরতিনটি হলো-

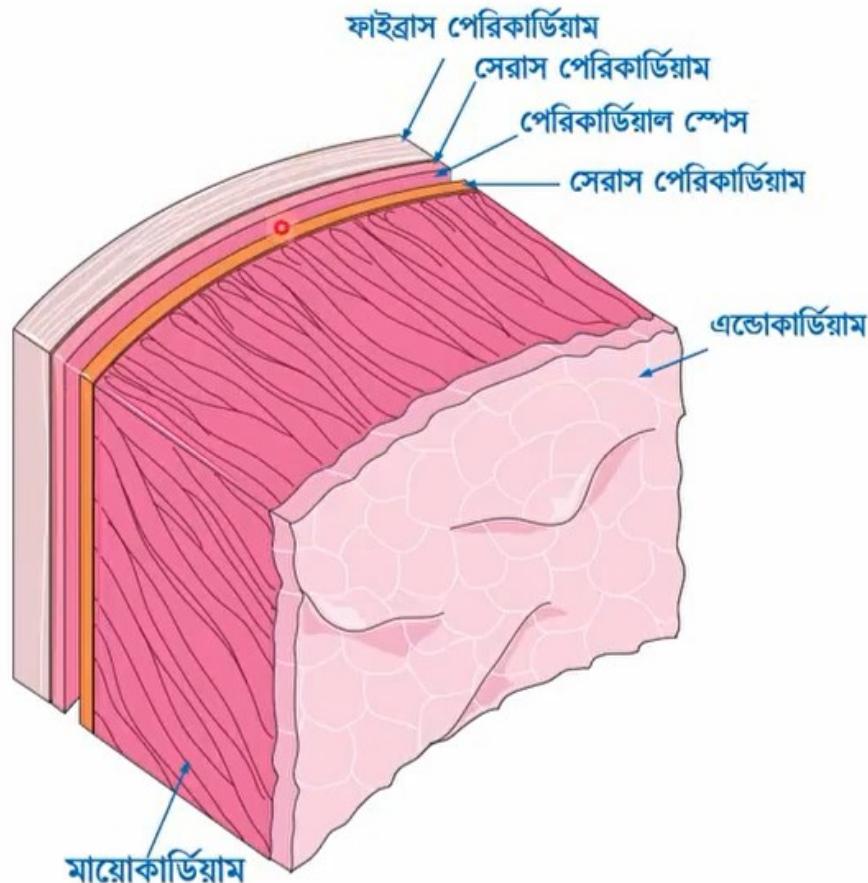
১. এপিকার্ডিয়াম (Epicardium): এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর।

২. মায়োকার্ডিয়াম (**Myocardium**) : এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর।

এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৎপিণ্ড সংকোচন- প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. এন্ডোকার্ডিয়াম (**Endocardium**) : এটি যোজক টিস্যু নির্মিত হৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর।

এটি হৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৎকপাটিকাসমূহ টেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।



## হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of heart)

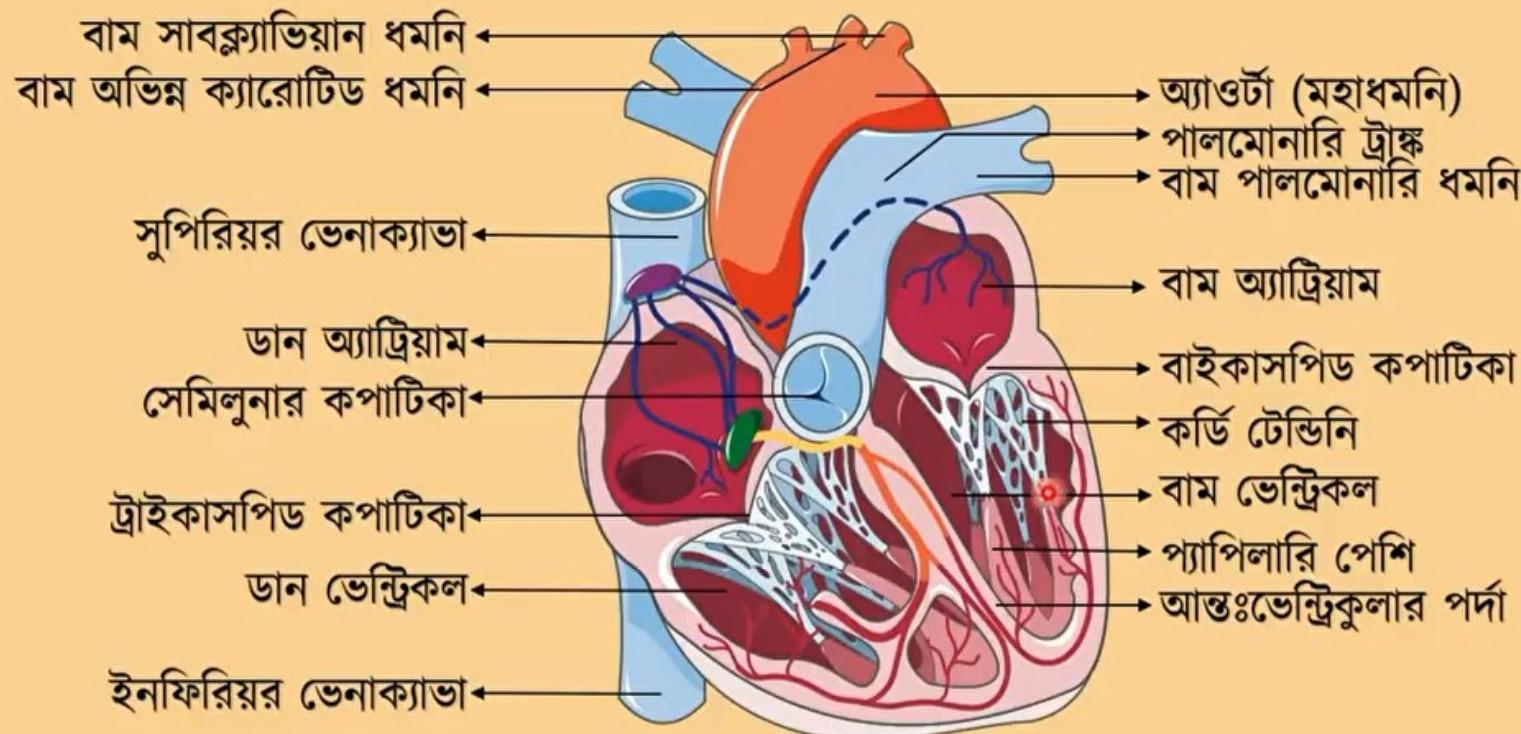
মানব হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (completely four chambered) একটি ফাঁপা অঙ্গ।

এর মধ্যে উপরের দুটি অ্যাট্রিয়া (**atria**; একবচনে **atrium**) বা অলিন্দ ও নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল (**Ventricle**) বা নিলয়।

দুটি অ্যাট্রিয়াকে দেহের অবস্থান অনুসারে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম বলে এবং ভেন্ট্রিকল দুটিকে ডান ভেন্ট্রিকল ও বাম ভেন্ট্রিকল বলা হয়।

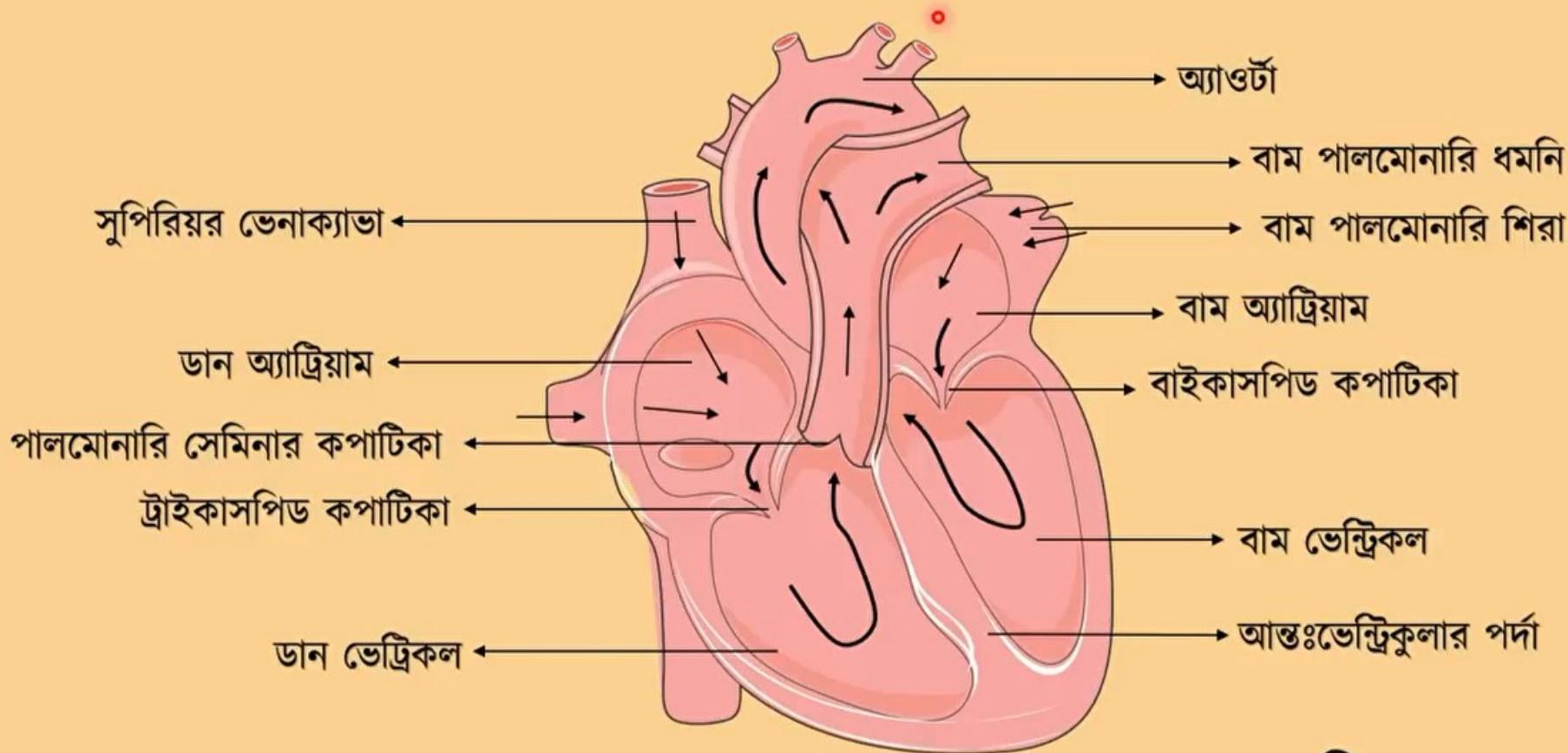
অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল।

ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াম আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল (আন্তঃঅলিন্দ) পর্দা (inter-atrial septum) এবং ডান ও বাম ভেন্ট্রিকল আন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) পর্দা (inter-ventricular septum) দিয়ে পৃথক থাকে।



মানব

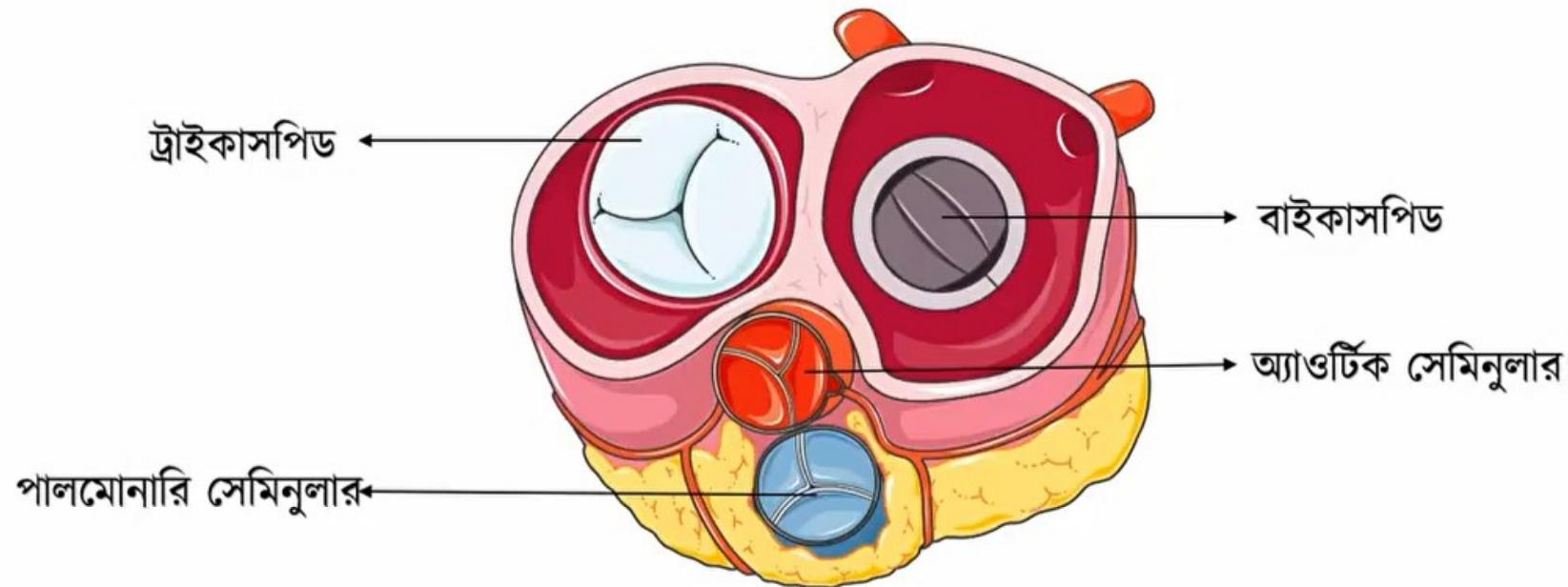
হৃৎপিণ্ডের অন্তর্গতন



হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

(→= রক্তের গতি নির্দেশক)

## হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (Valves of heart)



হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে রক্ত প্রবাহ একমুখী করার জন্য এবং  $O_2$ -সমৃদ্ধ ও  $CO_2$ -সমৃদ্ধ রক্তের মিশ্রণ প্রতিহত করার জন্য হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে কপাটিকা থাকে।

হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রাচীর বা এন্ডোকার্ডিয়াম ভাঁজ হয়ে কপাটিকা গঠিত হয়। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো ছক আকারে



## মানুষের হ্রস্পিণের বিভিন্ন কপাটিকার নাম, অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও কাজ

| নাম   | অবস্থান  | বৈশিষ্ট্য                           | কাজ   |
|---|--|-------------------------------------|---|
| ১. বাইকাসপিড কপাটিকা<br>বা মাইট্রাল কপাটিকা বা<br>দ্বিপত্রী কপাটিকা | বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম<br>ভেন্ট্রিকলের সংযোগ-স্থলে।    | দুটি বিল্লিময় কপাটিকা              | বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম<br>ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য<br>করে এবং এর বিপরীত<br>প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ২. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা বা<br>ত্রিপত্রী কপাটিকা                      | ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান<br>ভেন্ট্রিকলের সংযোগ-স্থলে।    | তিনটি বিল্লিময় কপাটিকা             | ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে ডান<br>ভেন্ট্রিকলে রক্তপ্রবাহে সাহায্য<br>করে এবং এর বিপরীত<br>প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ৩. অ্যাওটিক সেমিলুনার<br>কপাটিকা                                    | বাম ভেন্ট্রিকল থেকে<br>অ্যাওটার কপাটিকা<br>সংযোগস্থলে। | অর্ধচন্দ্রাকার/সেমিলুনার<br>কপাটিকা | বাম ভেন্ট্রিকল থেকে<br>অ্যাওটায় রক্তপ্রবাহে সাহায্য<br>করে এবং এর বিপরীত<br>প্রবাহে বাধা দেয়।         |

|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| ৪. পালমোনারি সেমিলুনার<br>কপাটিকা   | ডান ভেন্ট্রিকল থেকে<br>পালমোনারি ধমনির<br>সংযোগস্থলে।        | অর্ধচন্দ্রাকার/ <span style="color:red">সেমিলুনার</span><br>কপাটিকা | ডান ভেন্ট্রিকল থেকে<br>পালমোনারি ধমনিতে<br>রক্তপ্রবাহে সাহায্য করে এবং<br>এর বিপরীত প্রবাহে বাধা<br>দেয়।     |
| ৫. থিবেসিয়ান বা করোনারি<br>কপাটিকা | করোনারি সাইনাস ও ডান<br>অ্যাট্রিয়ামের সংযোগ-স্থলে।          | সেমিলুনার কপাটিকা   | করোনারি সাইনাস থেকে<br>ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে<br>সাহায্য করে এবং এর<br>বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়।       |
| ৬. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা             | ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও<br>ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগ-<br>স্থল। | সেমিলুনার কপাটিকা   | ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা থেকে<br>ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তপ্রবাহে<br>সাহায্য করে এবং এর<br>বিপরীত প্রবাহে বাধা দেয়। |

## হৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন - দ্বিতীয় সংবহন

হৎপিণ্ড একটি সংকোচন-প্রসারণশীল জীবন্ত পাম্পযন্ত্রের মতো কাজ করে।

প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষে বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার (গড়ে ৭৫ বার) হৎস্পন্দন ঘটে অর্থাৎ দিনে প্রায় একলক্ষ বার স্পন্দন ঘটে।

এতে প্রায় ১৪০০ লিটার রক্ত সঞ্চালিত হয়।

তাছাড়া এতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাতে ধমনি, শিরা ও কৈশিকজালকের মাধ্যমে ৮০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক পথ অতিক্রম সম্ভব হয়।

হৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিটোল (**systole**) ও ডায়াস্টোল (**diastole**) বলে।

একটি সিস্টোল ও তার পরবর্তী একটি ডায়াস্টোল নিয়ে একটি হৎস্পন্দন (**heart beat**) সম্পন্ন হয়।

## দ্বিতনী সংবহন

মানুষের হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে দ্বিতনী সংবহন (double circulation) সংঘটিত হয়।

দ্বিতনী সংবহনের অর্থ হলো রক্ত সমগ্র দেহে প্রতিবার সংবহনের জন্য দুবার হৃৎপিণ্ডে অতিক্রম করে।

দ্বিতনী সংবহনের মধ্যে একটি হচ্ছে পালমোনারি (pulmonary) সংবহন-হৃৎপিণ্ড থেকে ফুসফুস এবং অন্যটি সিস্টেমিক (systemic) সংবহন-হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের অবশিষ্ট অংশে।

**হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন হয় না কেন? (Why is heart never fatigued ?) :**

একটি উদ্দীপনা প্রয়োগের পরবর্তী যে সময়কালের মধ্যে কোনো উদ্দীপনশীল কোষ বা টিসু দ্বিতীয় উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না, তাকে নিঃসাড়কাল বলে।

হৃৎপিণ্ড গঠনকারী হৃৎপেশি দীর্ঘতম নিঃসাড়কালের অধিকারী হওয়ায় তা কখনও অবসন্ন হয় না।

সাধারণত পরপর সংকোচনের ফলে বিপাকীয় বর্জ্য (বিশেষ করে ল্যাকটিক এসিড) জমা হওয়ার কারণে কোষ বা টিসু অবসন্ন হয়।

হৃৎপেশির নিঃসাড়কাল দীর্ঘ হওয়ায় তা ঐ সময়ের মধ্যে বর্জ্য পদার্থ থেকে মুক্ত হয়।

এছাড়া হৃৎপেশি সরাসরি ল্যাকটিক এসিডকে পুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে। এসব কারণে হৃৎপিণ্ড কখনও অবসন্ন হয় না।

# হৎপিণ্ডের প্রধান গাঠনিক উপাদানসমূহ এবং এদের কাজ

| হৎপিণ্ডের গাঠনিক<br>উপাদান | প্রধান কাজ  |
|----------------------------|---|
| অ্যাওর্টা                  | অ্যাওর্টা দেহের বৃহত্তম ধমনি। ফুসফুস ছাড়া অন্য সকল অঙ্গে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ (oxygenated) রক্ত পরিবহন করে। পালমোনারি ধমনি অক্সিজেন-রিক্ত (de-oxygenated) রক্ত ফুসফুসে বহন করে। |
| পালমোনারি শিরা             | ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৎপিণ্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে পরিবহন করে।  |
| বাম আট্রিয়াম              | পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।   |
| বাম ভেন্ট্রিকল             | হৎপিণ্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ। অ্যাওর্টার মাধ্যমে সারাদেহে রক্ত রক্ত পাম্প করে।   |
| বাইকাসপিড কপাটিকা          | বাম ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাত প্রবাহ প্রতিরোধ করে।  |
| কর্ডি টেক্সিনি             | ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে কপাটিকার অভ্যন্তর ভাগ বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া প্রতিরোধ করে এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে পশ্চাত প্রবাহে বাধা দেয়।                        |
| ডান ভেন্ট্রিকল             | পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্তকে ফুসফুসে পাম্প করে।  |
| ট্রাইকাসপিড কপাটিকা        | ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাত প্রবাহ প্রতিরোধে করে।   |

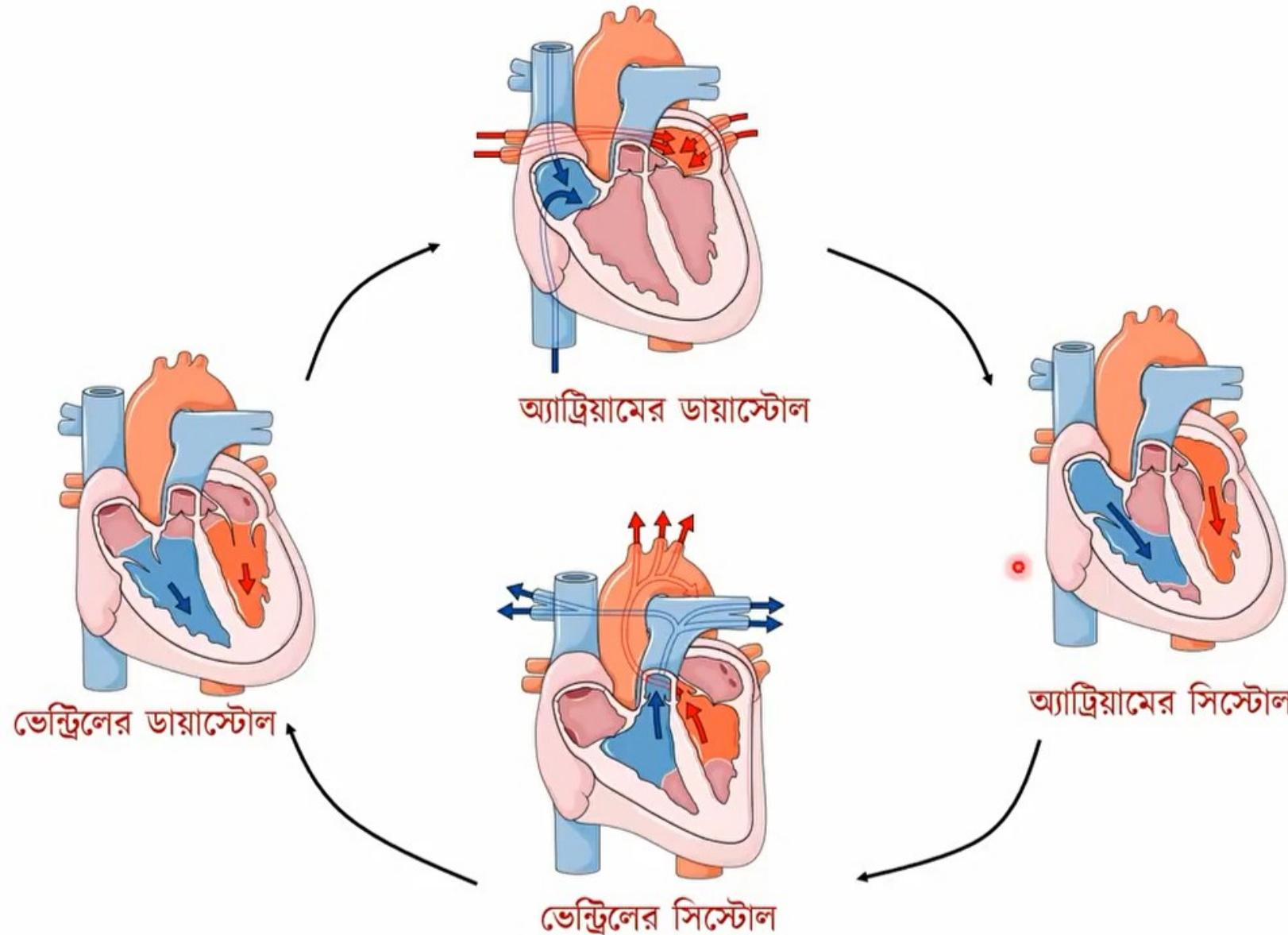
|                   |   |
|-------------------|---|
| সেমিলুনার কপাটিকা | ডান ভেন্ট্রিকলের শিথিল অবস্থায় পালমোনারি ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাত্ত প্রবাহ প্রতিরোধ করে এবং মহাধমনি থেকে রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে পশ্চাত্ত প্রবাহে বাধা দেয়। |
| ডান আত্রিয়াম     | ভেনাক্যাভার মাধ্যমে ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্য সকল অঙ্গ থেকে অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত গ্রহণ করে।  |
| ভেনা ক্যাভা       | দেহের এই প্রধান শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।   |

## মাছ এবং মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য

| মাছের হৃৎপিণ্ড                                 | মানুষের হৃৎপিণ্ড  |
|--|---|
| ১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।                        | ১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।   |
| ২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।          | ২. দুটি অ্যাট্রিয়া ও দুটি ভেন্ট্রিকল।                                      |
| ৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।         | ৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই।  |
| ৪. কেবল $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। | ৪. $\text{O}_2$ -সমৃদ্ধ ও $\text{CO}_2$ -সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে। |
| ৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।                     | ৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।   |

## হার্টবিট-কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল  $\frac{60}{75} = 0.8$  সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।



সুতরাং, হৎপিণ্ডের শব্দগুলো হচ্ছে-

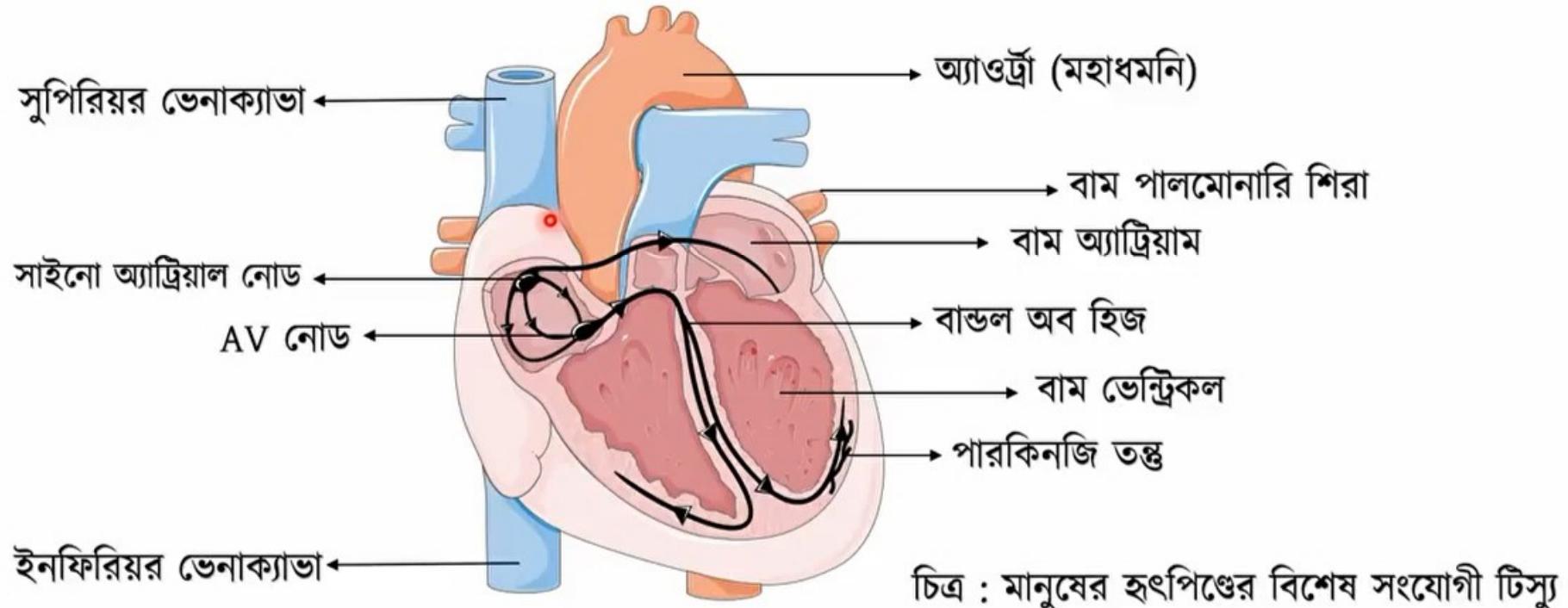
ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল = লাব (*lub*); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (*dub*)।

| অ্যাট্রিয়াম |         | ভেন্ট্রিকল |         |
|--------------|---------|------------|---------|
| ডায়াস্টোল   | সিস্টোল | ডায়াস্টোল | সিস্টোল |
| ০.৭ সে.      | ০.১ সে. | ০.৫ সে.    | ০.৩ সে. |

# হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পরিবহন

বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়মিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মাইয়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (myogenic = muscle origin; myo = muscle genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোন উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হস্পন্দন তৈরি হয়।

প্রকৃতপক্ষে হৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৎপিণ্ডের এ বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে সম্মিলিতভাবে সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু (junctional tissue) বলে।



# সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (Sino-Atrial Node, SAN)

**অবস্থানঃ** ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান অ্যাট্রিয়াম ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

**গঠনঃ** স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কিছু স্নায়ুপ্রান্তসহ অল্ল সংখ্যক হৎপেশী তন্ত্র নিয়ে গঠিত।

**পরিমাপঃ** ১০-১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু।

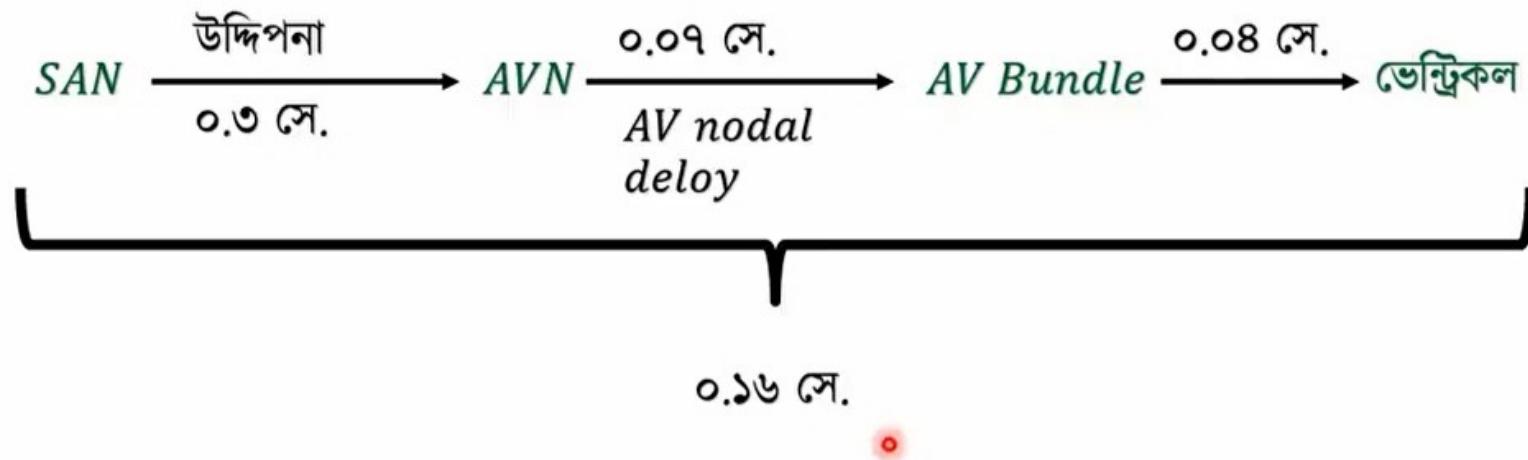
## কার্য প্রক্রিয়াঃ

*SAN → Action Potential → ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যাল → হার্টবিট*  
(অ্যাকশন পটেনশিয়াল)

*SAN* কে পেসমেকার (**pacemaker**) বলে কারণ প্রতিটি উত্তেজনার টেক্ট এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তি উত্তেজনার টেক্ট সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেও এটি কাজ করে।

# অ্যাট্রিও ভেন্ট্রিকুলার নোড (Atrio Ventricular Node, AVN)

অবস্থানঃ AV বাণ্ডেল নামক বিশেষ পেশিতন্ত্র গুচ্ছের সাথে।



## বান্ডল অব হিজ (Bundle of His):

হৎপিণ্ডের এ বিশেষ টিস্যুটি AV নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) প্রাচীরের পশ্চাত্ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত হয়ে ভেন্ট্রিলের পারকিঞ্জি তন্ত্রে মিলিত হয়। এটি AV নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্ট্রিলের প্রাচীরে সঞ্চারণ ঘটায়।

## পারকিঞ্জি তন্ত্র (Purkinje fibre) :

এ তন্ত্রগুলো বান্ডল অব হিজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভেন্ট্রিলের প্রাচীরে জালক সৃষ্টি করে। বান্ডল অব হিজ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা পারকিঞ্জি তন্ত্র মাধ্যমে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেন্ট্রিকল দুটির সংকোচন ঘটায়। হৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপঃ

SA নোড → AV নোড বান্ডল অব হিজ → পারকিঞ্জি তন্ত্র

## SAN ও AVN এর মধ্যে পার্থক্য

| SA Node (SAN)  | AV Node (AVN)   |
|--|---|
| ১. এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার হিস্তের নিকটে অবস্থিত। | ১. এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের আন্তঃঅ্যাট্রিয়াম পর্দার মূলদেশে অবস্থিত। |
| ২. এর ছন্দময়তা খুব বেশি।  | ২. এর ছন্দময়তা <sup>০</sup> খুব কম।                                |
| ৩. এটি স্পন্দনপ্রবাহ সৃষ্টি করে।                                       | ৩. এটি SA Node থেকে উৎপন্ন স্পন্দনপ্রবাহ গ্রহণ করে।                 |
| ৪. একে প্রেসমেকার বা ছন্দ-নিয়ামক বলে।                                 | ৪. একে সংরক্ষী ছন্দ-নিয়ামক বলে।                                    |

## রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা

### রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার (Blood pressure):

রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ বলে। হৎপিণ্ডের বিশেষ করে ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এর সংকোচনের ফলেই রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে অব্যাহত বহমান থাকে। **ভেন্ট্রিকলের সংকোচন (systole)** অবস্থায় রক্তচাপ বেশি থাকে এবং এ চাপকে সিস্টোলিক চাপ (systolic pressure) বলে।

অন্যদিকে ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ (diastole) কালে রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একে বলা হয় **ডায়াস্টোলিক চাপ** (diastolic pressure)। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে **১০০-১৩৯ mmHg** (অপটিমাম ১২০ mmHg) এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ **৬০-৮৯ mmHg** (অপটিমাম ৮০ mmHg)। রক্ত স্বাভাবিক সীমার উপরে থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ (hypertension) এবং স্বাভাবিক সীমার নিচে থাকলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বাম সাধারণ ক্যারোটিড ধমনি (hypotension) বলে। মানুষের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে স্ফিগমোম্যানোমিটার (sphygmomanometer) বলে। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে মানুষের রক্তচাপের তারতম্য ঘটে।

# ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত

(sensory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ

পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের ভারসাম্য

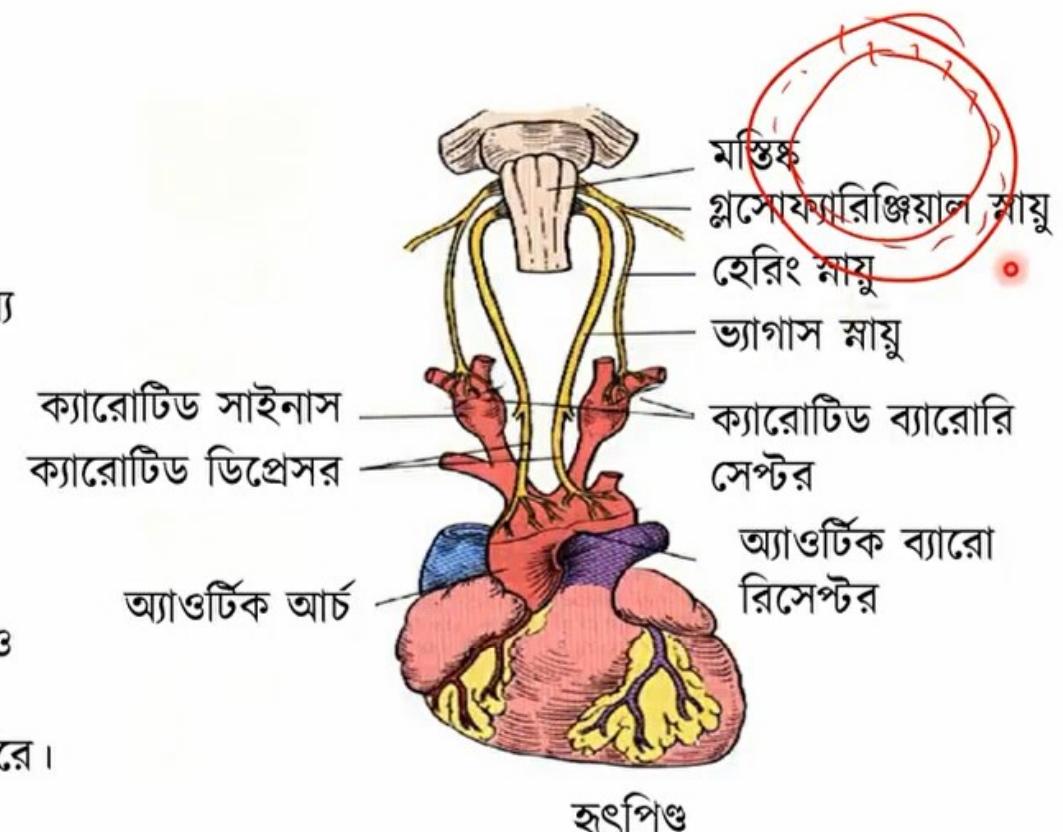
রক্ষা করে। এ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে।

স্নায়ু প্রান্ত অস্বাভাবিক রক্তচাপ শনাক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে

যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৎস্পন্দন মাত্রা ও

শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিককরণে ভূমিকা পালন করে।

সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি ব্যারোরিফ্লেক্স (baroreflex) নামে পরিচিত।



চিত্র : অ্যাওর্টিক এবং ক্যারোটিক  
ব্যারোরিসেপ্টর

# ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত

(sensory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ

পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের ভারসাম্য

রক্ষা করে। এ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে ব্যারোরিসেপ্টর বলে।

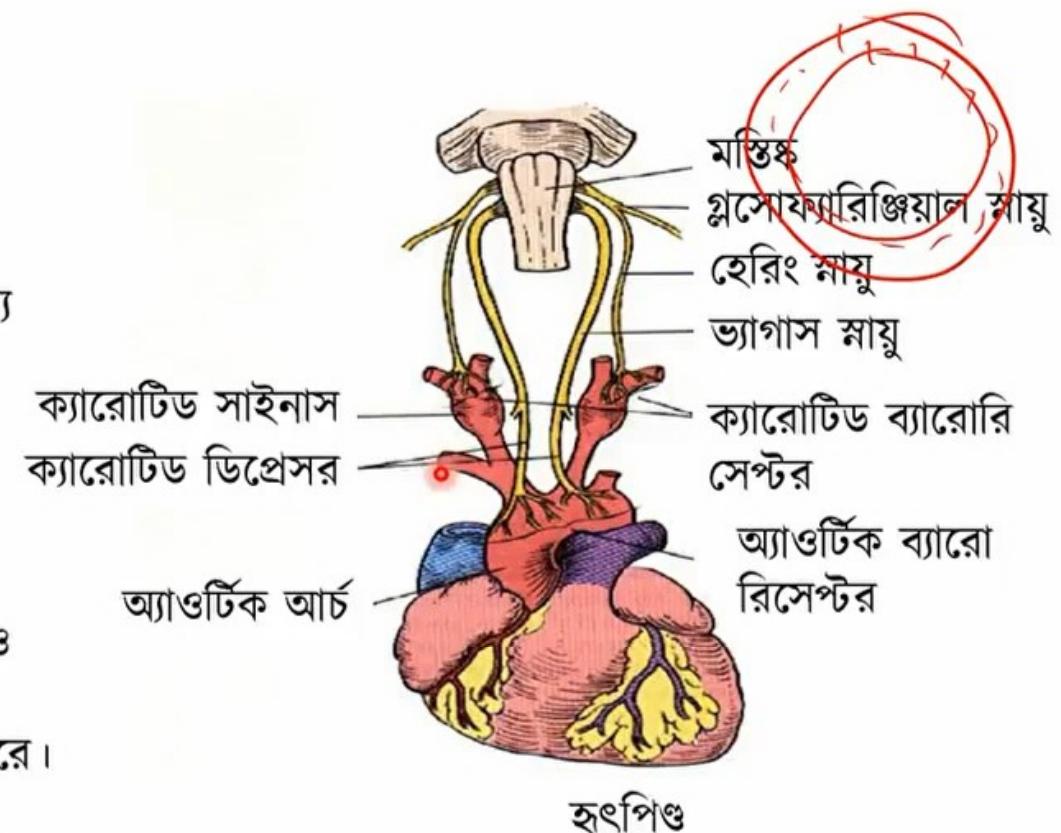
স্নায়ু প্রান্ত অস্বাভাবিক রক্তচাপ শনাক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে

যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৎস্পন্দন মাত্রা ও

শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিককরণে ভূমিকা পালন করে।

সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি ব্যারোরিফ্লেক্স (baroreflex) নামে পরিচিত।

ব্যারোরিসেপ্টর দু'রকম- উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর এবং নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর।

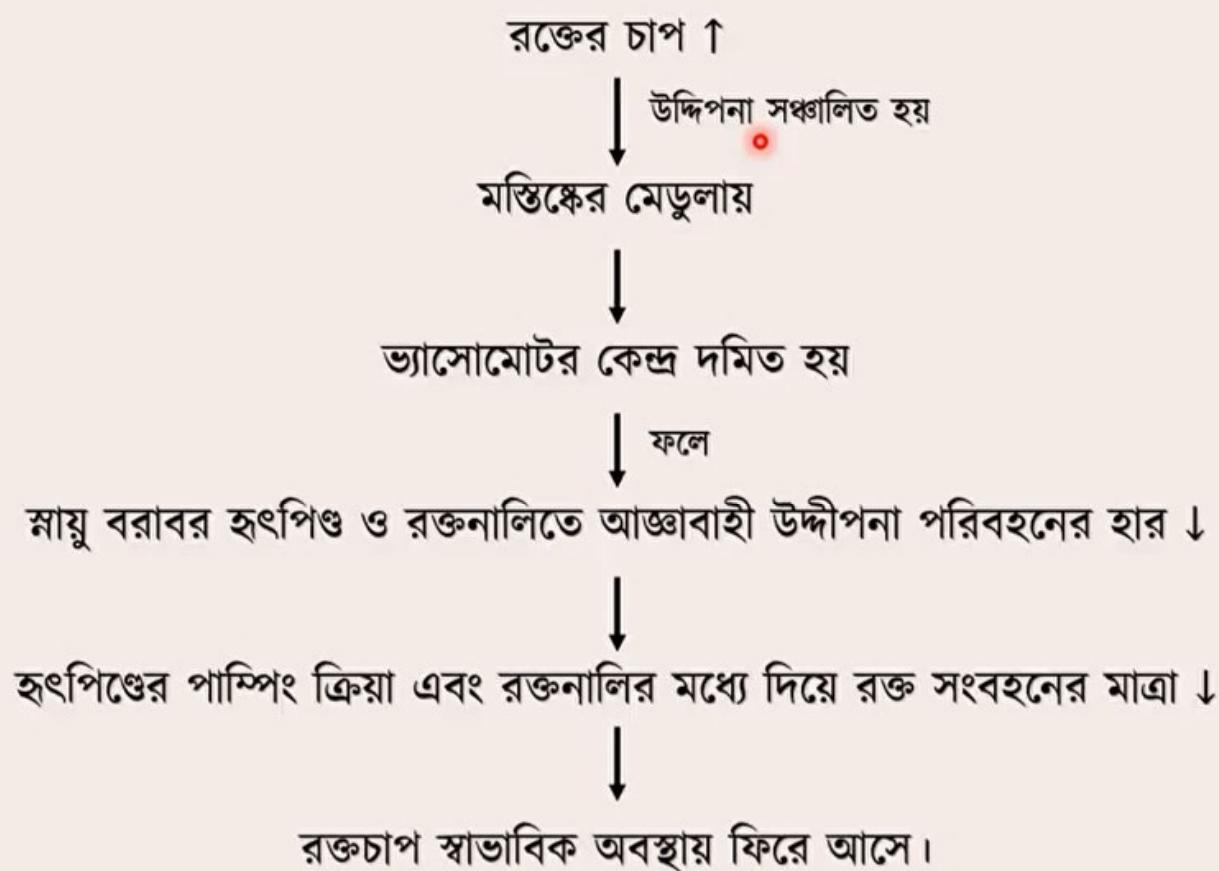


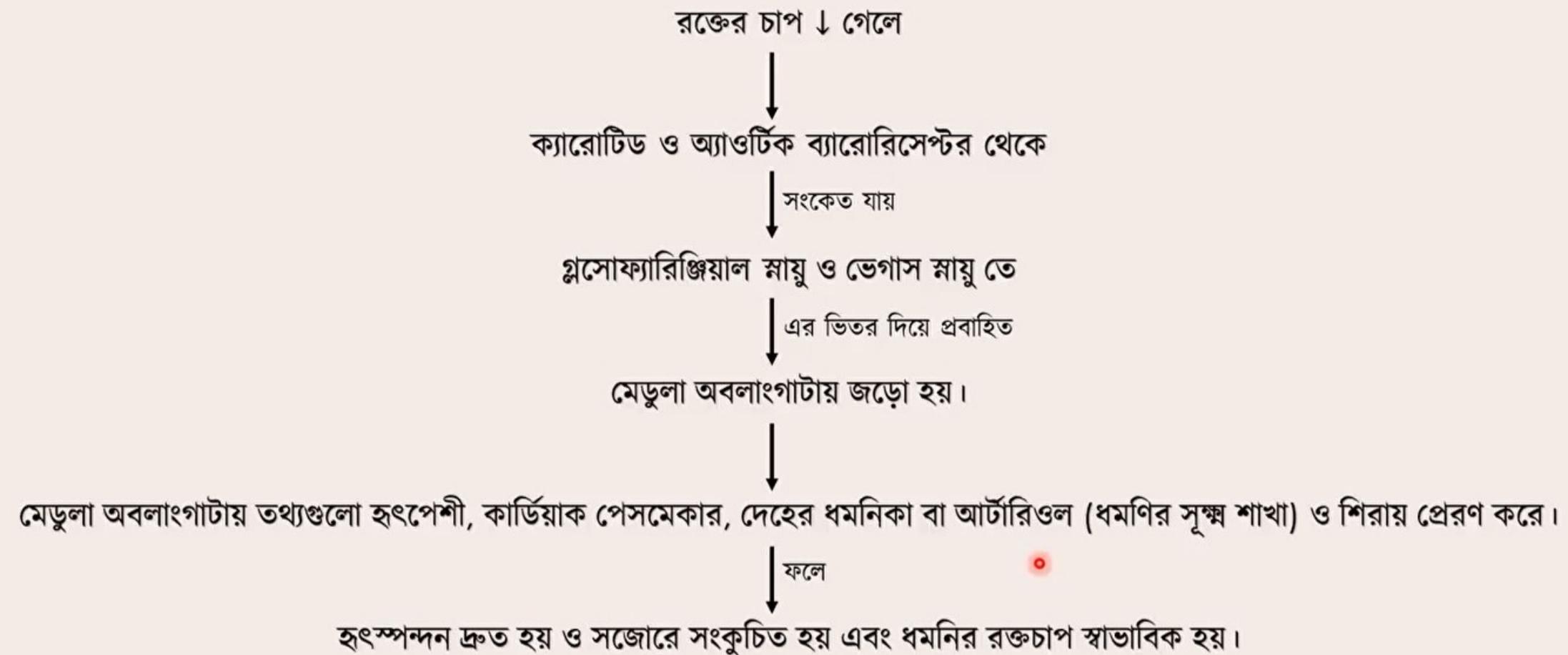
চিত্র : অ্যাওর্টিক এবং ক্যারোটিক  
ব্যারোরিসেপ্টর

## উচ্চাপ ব্যারোরিসেপ্টর

অবস্থানঃ অনুপস্থ অ্যাওটিক আর্চ এবং ডান ও বাম অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনির কারোটিড সাইনাস এ।

কার্য প্রক্রিয়াঃ



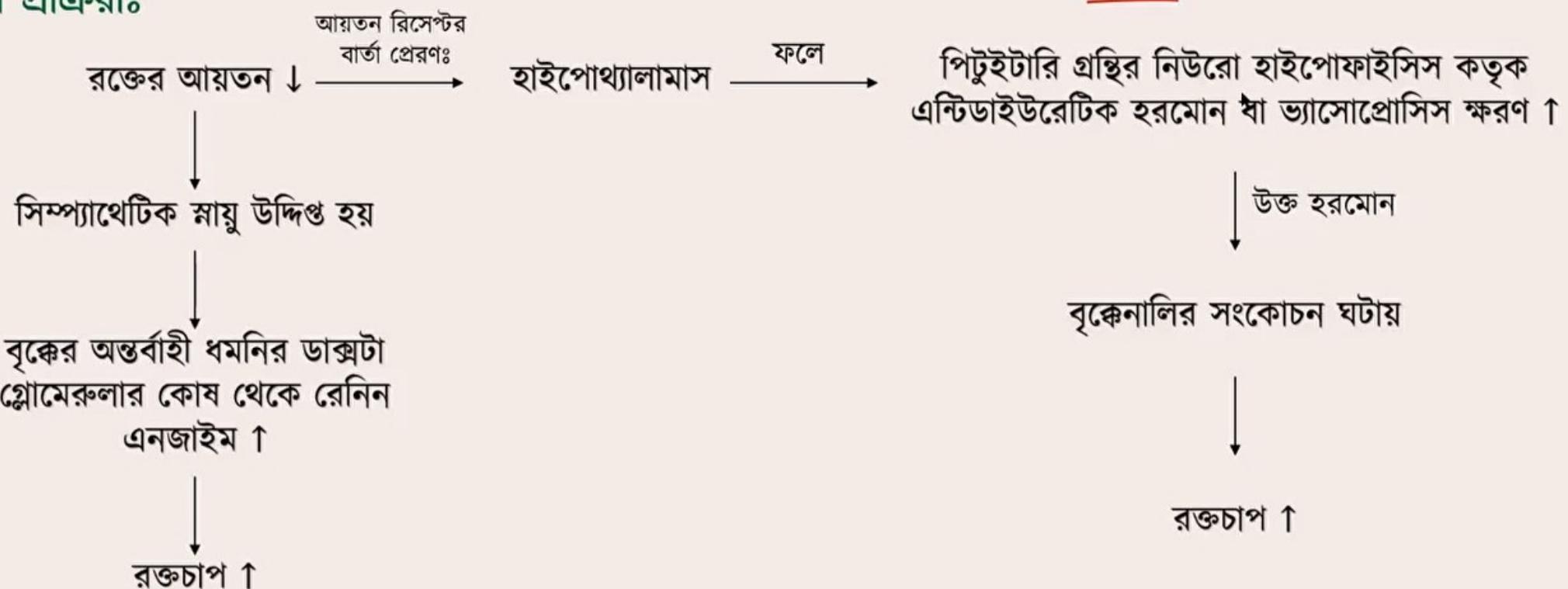


# নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর

অবস্থানঃ বড় বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে।

এই রিসেপ্টর গুলো রক্তের আয়তন নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে।

কার্য প্রক্রিয়াঃ

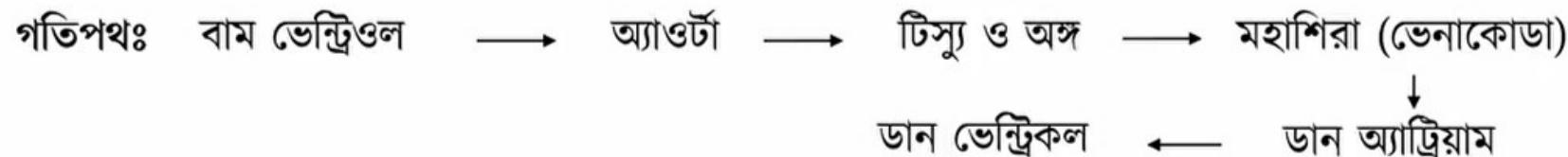


# মানবদেহে রক্ত সংবহন (Blood Circulation of Human Body)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র বন্ধ ধরনের (closed type)। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক নালির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে দ্বি-চক্রীয় সংবহন (double circulation) অর্থাৎ সিস্টেমিক (systemic) ও পালমোনারি (pulmonary) চক্র দেখা যায়। মানবদেহে চার প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা- ১. সিস্টেমিক, ২. পালমোনারি, ৩. পোর্টাল এবং ৪. করোনারি।

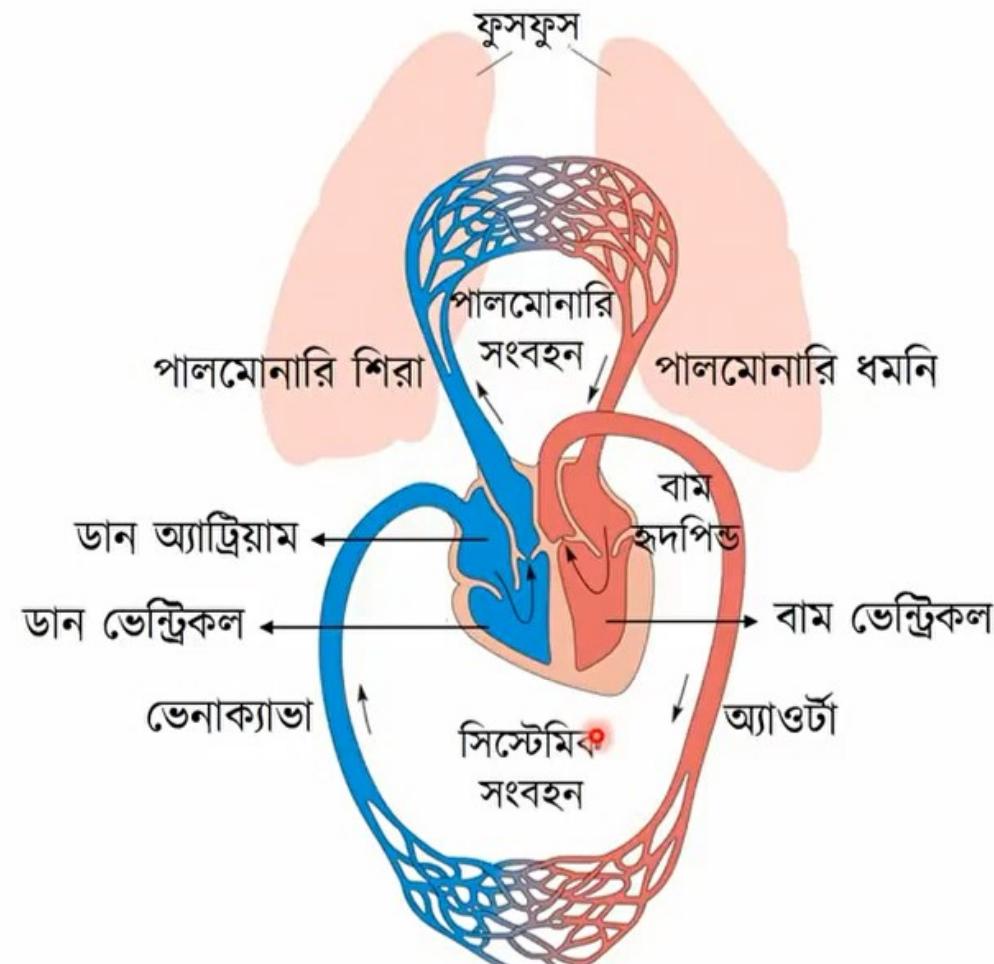
## ১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌছায় এবং অঙ্গ থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে সিস্টেমিক সংবহন বলে।



সময়কালঃ ২৫-৩০ সেকেন্ড

কাজঃ সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিক জালিকা<sup>o</sup> অতিক্রম কালে  $O_2$ , খাদ্যসার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্ট  $CO_2$ । রেচন পদার্থে ইত্যাদি কোষ থেকে অপসারিত হয়।



চিত্র: মানবদেহে রক্ত সংবহন

## ২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)

যে সংবহনে রক্ত হৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে পালমোনারি বা ফুসফুলীয় সংবহন বলে।

গতিপথঃ

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি → ফুসফুস → পালমোনারি শিরা → বাম অ্যাট্রিয়াম → বাম ভেন্ট্রিকল

কাজঃ এ সংবহনের মাধ্যমে  $CO_2$  সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেখানে অ্যালভিওলাস ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে  $O_2$  সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

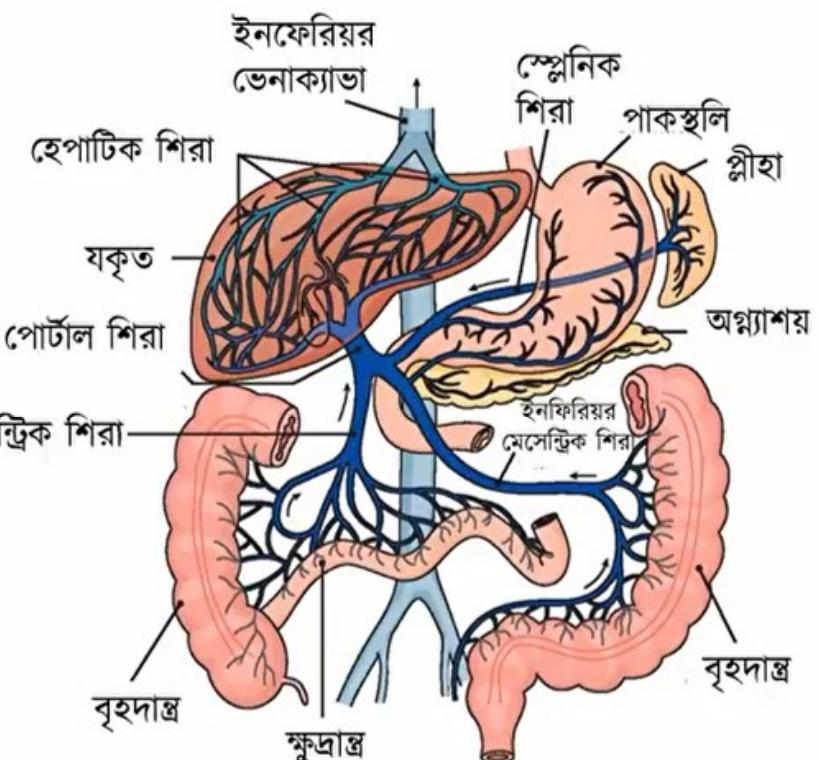
### ৩. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সিস্টেমিক ও পালমোনরি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে পোর্টাল সংবহন বলে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত হেপাটিক (hepatic) এবং রেনাল (renal)-এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টাল সংবহন মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অনুপস্থিত।

#### হেপাটিক (যকৃত) পোর্টাল সংবহন:

পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্তর, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ও প্লীহা থেকে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত হেপাটিক পোর্টাল শিরা (hepatic portal vein)-র ভিতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে হেপাটিক পোর্টাল সংবহন বলে।



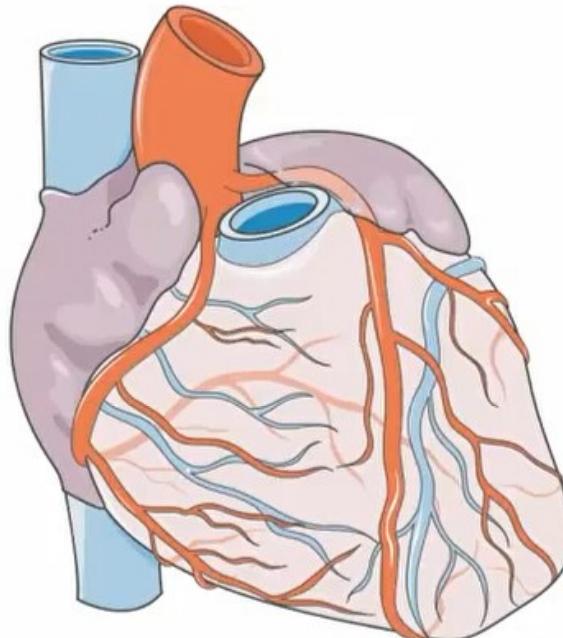
পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ → হেপাটিক পোর্টাল শিরা → যকৃত → হেপাটিক শিরা → ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা → ৯ হৎপিণ্ড

## হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা

- (i) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে পৌছায়। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন-এ পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়।
- (ii) নাইট্রোজেন ঘটিত দূষিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুম্বন্ধ হয়।
- (iii) যকৃত রক্তে প্রোটিন উৎপন্ন করে রক্তে **সরবরাহ** করে।

## 8. করোনারি সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রত্যেক কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি হৎপিণ্ড। হৎপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি ও অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। হৎপিণ্ডের হৎপেশিতে রক্ত সঞ্চালনকারি সংবহনকে করোনারি রক্ত সংবহন বলে।



সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৎপ্রাচীর → করোনারি শিরা → ডান অ্যাট্রিয়াম

## সিস্টেমিক এবং পালমোনারি সংবহনে পার্থক্য

| সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)   | পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)  |
|--|--|
| ১. রক্তের গতিপথ বাম ভেন্ট্রিকল থেকে দেহ টিস্যু এবং দেহ টিস্যু থেকে ডান অ্যাট্রিয়াম। | ১. রক্তের গতিপথ ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুস এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়াম।                   |
| ২. বাম ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে দেহ টিস্যু অতিক্রম করে ডান অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।   | ২. ডান ভেন্ট্রিকল থেকে শুরু হয়ে ফুসফুস অতিক্রম করে বাম অ্যাট্রিয়ামে শেষ হয়।                 |
| ৩. এ সংবহনে ধমনি অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত এবং শিরা অক্সিজেনরিক্ত রক্ত পরিবহন করে।         | ৩. এ সংবহনে পালমোনারি ধমনি অক্সিজেনরিক্ত রক্ত ও পালমোনারি শিরা অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে। |
| ৪. দেহ টিস্যুতে পুষ্টি সরবরাহ করে।   | ৪. অক্সিজেন সংগ্রহের জন্য ফুসফুসে গমন করে।   |
| ৫. রক্তচাপ বেশি।   | ৫. রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে কম।   |

# বুকের ব্যথা (Chest Pain)

| বুক ব্যথার প্রকারভেদ                                     | লক্ষণ/কারণ  |
|--|---|
| ১. প্ল্যুরাইসি (Pleurisy)                                | ভাইরাসের সংক্রমণে ফুসফুসের আবরণে (প্ল্যুরাইটিস) প্রদাহ।   |
| ২. নিউমোনিয়া (Pneumonia)                                | ফুসফুসে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ; প্ল্যুরাল যন্ত্রণা।  |
| ৩. পালমোনারি এমবোলিজম (Pulmonary embolism)               | শ্রেণিদেশ বা নিম্নাংসের শিরা থেকে জমাট রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ; পালমোনারি ইনফার্কশন সৃষ্টি; তীব্র বুক ব্যথা ও কাশ।                      |
| ৪. কস্টোকন্ডাইটিস (Costochondritis)                      | পশ্চিম ও বক্ষাস্থির তরঙ্গাস্থির সংযোগস্থলে প্রদাহ; দীর্ঘকালীন বুক ব্যথা।  |
| ৫. পশ্চার ভাঙ্গন, পেশিটান (Rib fractures, Muscle strain) | বুকে তীব্র ব্যথা; নড়া-চড়া, কাশি দেয়া কষ্টকর।   |
| ৬. স্নায়ুতে চাপ (Nerve compression)                     | স্নায়ুমূলে হাড়ের চাপ; বুক ও উর্ধ্ববাহুতে ব্যথা।   |
| ৭. পিত্ত পাথুরি (Gallstones)                             | পিত্তথলিতে পাথর হলে বুক, পিঠ ও উদরের উপরের অংশে ব্যথা।  |
| ৮. দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত (Anxiety and Panic Attacks)  | দুশ্চিন্তা, অবসন্নতা ও আতঙ্কগ্রস্ত হলে কয়েক মিনিট থেকে কয়েকদিন বুকে ব্যথা; ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, মাথা বিমবিম করা, হতবুদ্ধি হওয়া। |

# কার্ডিওভাস্কুলার রোগ (Cardiovascular disease) বা হৃদরোগ (Heart disease)

হৃৎপিণ্ড এবং রক্তনালির রোগকে কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বলা হয়। কার্ডিওভাস্কুলার রোগকে হৃদরোগ-ও বলে।

কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বা হৃদরোগ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ

১. করোনারি ধমনি রোগ/করোনারি হৃদরোগ
২. কার্ডিওমেগালি (হৃদপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া)
৩. হার্ট ভালভ রোগ
৪. কনজেনাইটাল হার্ট ডিজিজ (congenital heart disease; জন্মকালে হৃৎপিণ্ডে বিকলাঙ্গতা)
৫. পেরিকার্ডাইটিস
৬. কার্ডিওমায়োপ্যাথি (হৎপেশির রোগ)
৭. রিউম্যাটিক হৃদরোগ (rheumatic heart disease; স্টেপ্টোকক্স ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্টি রিউম্যাটিক জ্বর এর কারণে হৎপেশি এবং ভাল রোগ) ইত্যাদি।

# অ্যানজাইনা (Angina) বা হৃদশূল

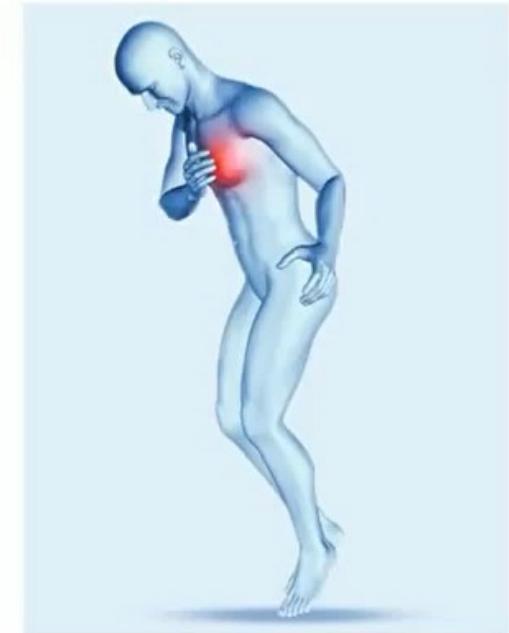
হৎপেশী যখন  $O_2$ -সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্ফ্রিত অনুভূত হলে সে ধরনের ব্যথাকে অ্যানজাইনা বা অ্যানজাইনা পেকটোরিস (angina / angina pectoris) বলে। অ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

## • আনজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১. উরঃফলক বা স্টোর্নামের (sternum) পিছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
২. ব্যায়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতি ভোজন, শৈত্য বা আতংকে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫-৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
৩. অ্যানজাইনা গলা, কাথ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাতেও ছড়াতে পারে।
৪. অনেক সময় ব্যথা কোথেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
৫. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্ফ্রিতের প্রকাশ ঘটায়।
৬. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গন্ধগোল ও বমি ভাব হতে পারে।
৭. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

## • করণীয় / প্রতিকার (Control)

সুস্মাঞ্চলের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে রাখাই হচ্ছে অ্যানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্যে কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্গভেদ, হৃদরোগ ও অ্যানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে: হাঁটা-চলা বা ব্যায়াম রা, স্তুলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও স্ববান্ধব খাবার খাওয়া, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ত্যাগ করা; মদপানের ধারে কাছে না যাওয়া, বছরে একবার (সম্ভব হলে দুবার) সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া।



# হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infarction)

চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্লাক (plaque) গঠন করে। একে করোনারি অ্যাথেরোমা (coronary atheroma) বলে।

এভাবে প্লাক শক্ত হতে হতে যখন চরম পর্যায়ে পৌছায় তখন এগুলো বিদীর্ণ হয়। অণুচক্রিকা জমা হয়ে প্লাকের চতুর্দিকে তখন রক্ত জমাট বাঁধাতে শুরু করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হৎপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৎপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায়। এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর নাম হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (myocardial infarction; মায়োকার্ডিয়াল অর্থ হৎপেশি, আর ইনফার্কশন অর্থ অপর্যাঙ্গ রুক্ষ প্রবাহের



## • হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ের ভিতর বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

1. বুকে ব্যথা (Chest-pain) : বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ান, আছড়ান বা ব্যথা অনুভূত হয়।



2. উর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশে অস্বস্তি  
(Discomfort in other areas of the upper body) :  
এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল বা পাকস্তলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব।



৩. ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (Shortness of breath) : বুকে অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। অনেক সময় বুকে অস্বস্তি হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে।



৪. বমি-বমি ভাব (Nausea) বা বমি হওয়া: পাকস্থলিতে অস্বস্তির সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হঠাতে মাথা ঝিমকিম করা অথবা ঠান্ডা ঘাম বেরিয়ে যাওয়া।



৫. ঘুমে ব্যাঘাত (Sleep disturbance) : ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শক্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ করা।



- **প্রতিরোধ**

১. ঝাতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে।
২. চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
৩. বডি-মাস ইন্ডেক্স (Body Mass Index, BM) মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
৪. সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন- প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা ইত্যাদি) করতে হবে।
৫. ধূমপায়ী হলে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, অধূমপায়ী হলে ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।
৬. জীবনাভ্যাসে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ রাখতে হবে।
৭. কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৮. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা বন্ধ করতে হবে।
৯. বছরে অন্তত একবার (সম্ভব হলে দুবার) সমগ্র দেহ চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে।

# হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক

সাধারণ মানুষের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। অনেক সময় দুটোকে এক করে দেখ হয়। নিচে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো।

## হার্ট অ্যাটাক

১. হৎপিণ্ডের করোনারি ধমনির ভিতর তৎক্ষণ পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে রক্ত সরবরাহ না পেয়ে হৎপেশি মরে যাওয়ায় যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

২. হৎপিণ্ডের কোনো ধমনিতে তৎক্ষণ পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টি হলে হার্ট অ্যাটাক হয়।

৩. হার্ট অ্যাটাকের ফলে বুকের মাঝখানে অসহ্য চাপ বা অস্বস্তি, বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা দমবন্ধনা, শীতল ঘাম, এমনকি পর্যন্ত হতে পারে।

৪. ডাক্তারের পরামর্শ মতো কার্যকর ঔষুধ সেবন করা।  
এনজিওপ্লাস্টি বা বাইপাস সার্জারি ইত্যাদি হলো হার্ট অ্যাটাকের চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা।

## স্ট্রোক

১. মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী কোনো ধমনির (যেমন- ক্যারোটিড ধমনি) ভিতরে তৎক্ষণ পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তাকে স্ট্রোক বলে।

২. মস্তিষ্কের কোনো ধমনিতে তৎক্ষণ পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টি, উচ্চ রক্তচাপের দরুণ মস্তিষ্কের কোনো ধমনি ফেটে গেলে অথবা মস্তিষ্কের কোনো ধমনির অনিয়ন্ত্রিত সংকোচন বা আপেক্ষের কারণে স্ট্রোক হয়।

৩. স্ট্রোকের ফলে স্মৃতিভঙ্গ, বাকলোপ, চেতনালোপ প্যারালাইসিস, নাক ও মুখ দিয়ে রক্তক্ষরণ, এমনকি আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

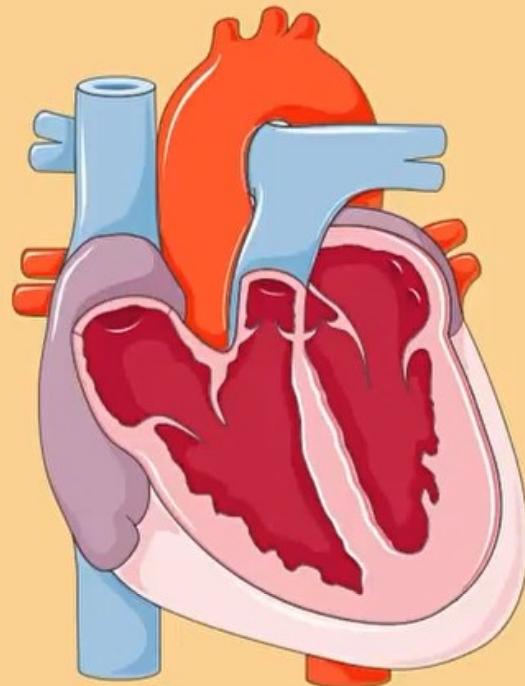
৪. ডাক্তারের পরামর্শ মতো কার্যকর ঔষুধ সেবন করা।  
প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি নেয়া ইত্যাদি হলো স্ট্রোকের চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা।

# হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

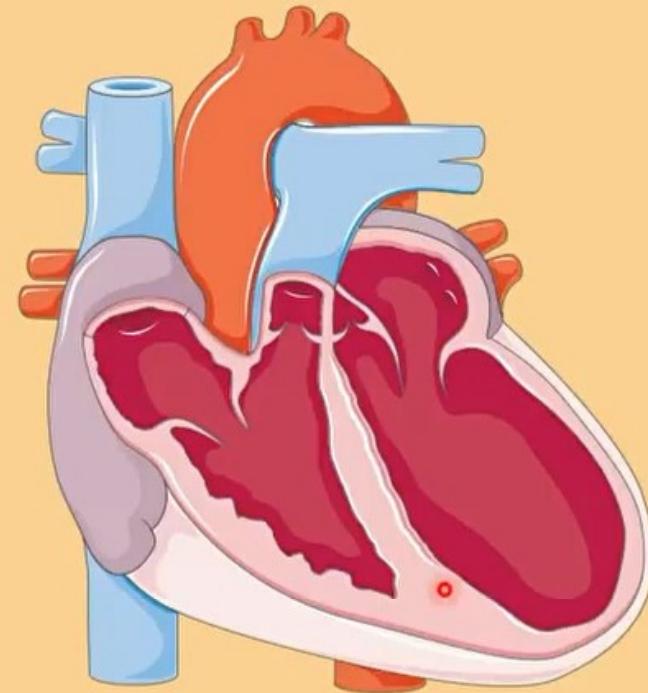
হৎপিণ্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্তের যোগান দিতে পারে না তখন এ অবস্থাকে হার্ট ফেইলিউর বলে। অনেক সময় হৎপিণ্ড রক্তে পরিপূর্ণ হতে না পারায়, কখনওবা হৎপ্রাচীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় এমনটি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উভয় সমস্যাই একসঙ্গে দেখা যায়। অতএব হার্ট ফেইলিউর মানে হৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেছে, বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তা নয়। তবে হার্ট ফেইলিউরকে হৎপিণ্ডের একটি মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

## হার্ট ফেইলিউরের কারণঃ

করোনারি ধমনির অন্তঃস্থ গাত্রে কোলেস্টেরল জমে ধমনির গহ্বর সংকীর্ণ করে দিলে হৎপ্রাচীর পর্যাপ্ত  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ থেকে বাধিত হয়। কালান্তরে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। উচ্চ রক্তচাপ বেশি দিন স্থায়ী হলে ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীরে কোলেস্টেরল জমার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং হৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস হলে দেহ পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিকভাবে ব্যবহারও করতে পারে না। এ কারণে ধীরে ধীরে হৎপেশি ও হৎপিণ্ডের বাহিকাণ্ডলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। হৎপিণ্ডে জন্মগত বা সংক্রমণজনিত কারণেও হার্ট ফেইলিউর ঘটতে পারে।



সাধারণ হৃদপিণ্ড



হার্ট ফেইলিউর

- হাঁট ফেইলিউরের লক্ষণঃ

১. সক্রিয়, নিক্রিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা এবং ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. সাদা বা গোলাপি রঙের রক্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফোস ফোস করে শ্বাস-প্রশ্বাস।
৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে।
৪. পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা পরতে গেলে হঠাৎ আঁটসাট মনে হয়।
৫. প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। বাজার-সদাই করা, সিড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা হাঁটা সবকিছুতেই শ্রান্তিভাব।
৬. পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি ভাব থাকে।
৭. হৎস্পন্দন এত দ্রুত হয় মনে হবে যেন হৎপিণ্ড এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৮. কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্জস্যতা এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়।

## • হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার

হার্ট ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণত ৩ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়।

১. **জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন :** স্বাস্থ্যসম্মত আহার হচ্ছে রোগীদের প্রধান অবলম্বন।  
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য তালিকা দেখে নিয়মিত সুশ্রম পানাহার করা উচিত।



২. **ঔষধ গ্রহণ :** হার্ট ফেইলিউরের ধরন দেখে চিকিৎসক যে সব ঔষধ নির্বাচিত করবেন নিয়মিত তা সেবন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।



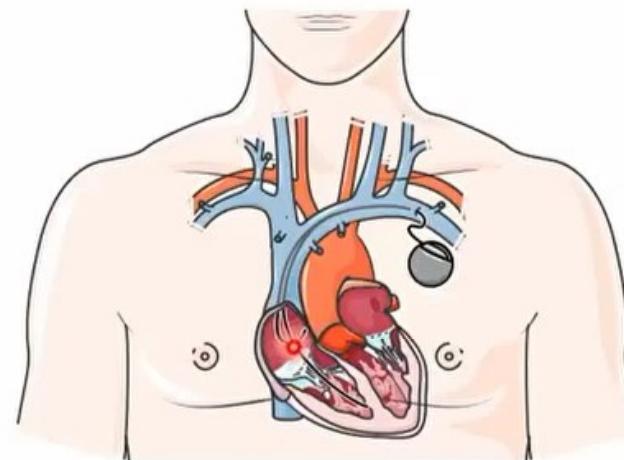
৩. **অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া :** হার্ট ফেইলিউর যেন খারাপের দিকে মোড় না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শারীরিক অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে হবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন- শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে টিস্যুতে পানি জমে থাকা।  
চিকিৎসককে বলতে হবে কখন ওজন পরীক্ষা করাতে হবে এবং ওজন পরিবর্তন সম্বন্ধে

# হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা (The Concept of the Treatment of Heart Diseases)

- **হৃদরোগ নির্ণয়** নিচে বর্ণিত উপায়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৃদরোগ নির্ণয় করতে পারেন।
  1. চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখে হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
  2. বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।
  3. ইসিজি (Electrocardiogram) হৎপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।
  4. ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-র সাহায্যে হৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
  5. রক্তের BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
  6. করোনারি এনজিওগ্রাম-এর সাহায্যে হৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
  7. হৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষার মাধ্যমে।
  8. উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করে হৃদরোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। হার্ট অ্যাটাক হলে Troponion-I পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়।

# পেসমেকার (Pacemaker)

হৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম-প্রাচীরের উপর দিকে অবস্থিত, বিশেষায়িত কার্ডিয়াক পেশিগুচ্ছে গঠিত ও স্বয়ংক্রিয়। স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট অংশ যা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে হৎস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং স্পন্দনের ছন্দময়তা বজায় রাখে তাকে পেসমেকার বলে। মানুষের হৎপিণ্ডে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node) হচ্ছে পেসমেকার। এটি অকেজো বা অসুস্থ হলে হৎস্পন্দন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র দেহে স্থাপন করা হয় তাকেও পেসমেকার বলে।



অতএব, পেসমেকার দুধরনের একটি হচ্ছে হৎপিণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপী সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SA নোড) যা প্রাকৃতিক

# পেসমেকার (Pacemaker)

- যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities)

অসুস্থ ও দুর্বল হৃৎপিণ্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে স্থাপিত ছোট এক বিশেষ যন্ত্রকে পেসমেকার বলে।

হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর লয় বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়ত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্পন্দন হলে তাকে অ্যারিথমিয়া (arrhythmia) বলে। এমন অবস্থায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। প্রচলিত অ্যারিথমিয়ায় দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে সব ধরনের অ্যারিথমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাকি জীবন সক্রিয় থাকা যায়। দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।



William Chardack



# পেসমেকার (Pacemaker)

- যান্ত্রিক পেসমেকার গঠন

একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার নিয়ে একটি পেসমেকার গঠিত। সেন্সরগুলোকে ইলেক্ট্রোড (electrode) বলে।

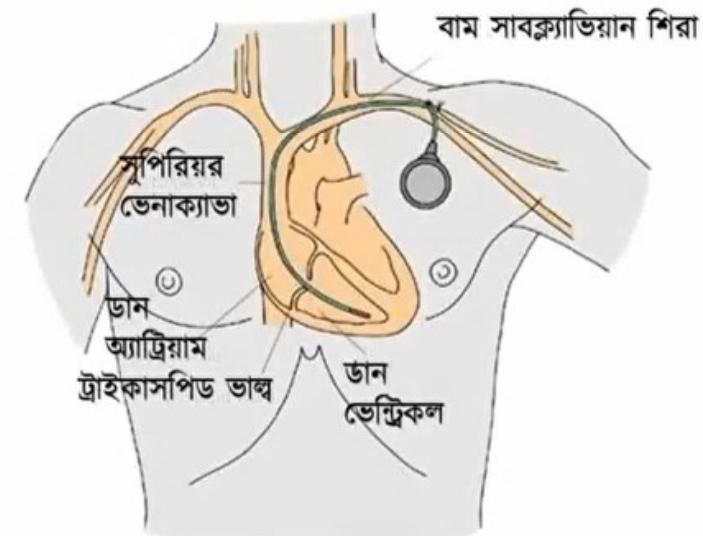
ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। ব্যাটারি ও জেনারেটর একটি পাতলা ধাতব বাল্কে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেক্ট্রোডগুলো হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে।

পেসমেকারে অপরিরাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। পেসমেকারের তারকে লিড (lead) বলে। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার (লিড) প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

## ১. এক-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (Single-chamber pacemaker) :

এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার বা লিড থাকে।

যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিণ্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এ বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।



# পেসমেকার (Pacemaker)

২. দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (**Dual-chamber pacemaker**) : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৎপিণ্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।



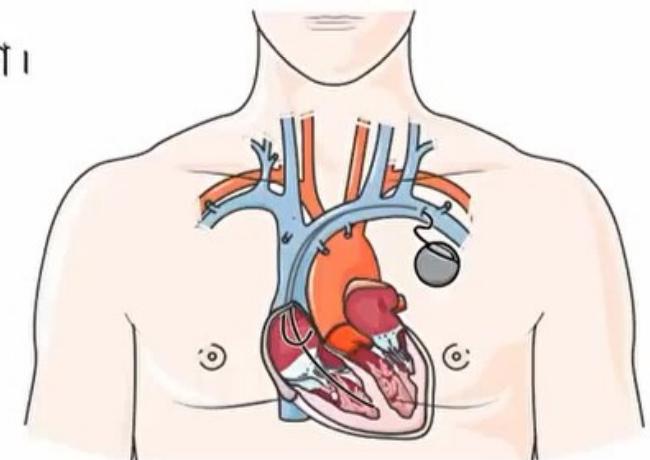
৩. ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার (**Triple-chamber pacemaker**) : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার (লিড) থাকে যার একটি জেনারেটর থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে, আরেকটি ডান ভেন্ট্রিকলে এবং অন্যটি বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল হৎপেশির হৎপিণ্ডে স্থাপন করা হয় (না হলে হার্ট ফেইলিউরের আশঙ্কা থাকে)। পেসমেকার এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকলদুটিকে সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়।

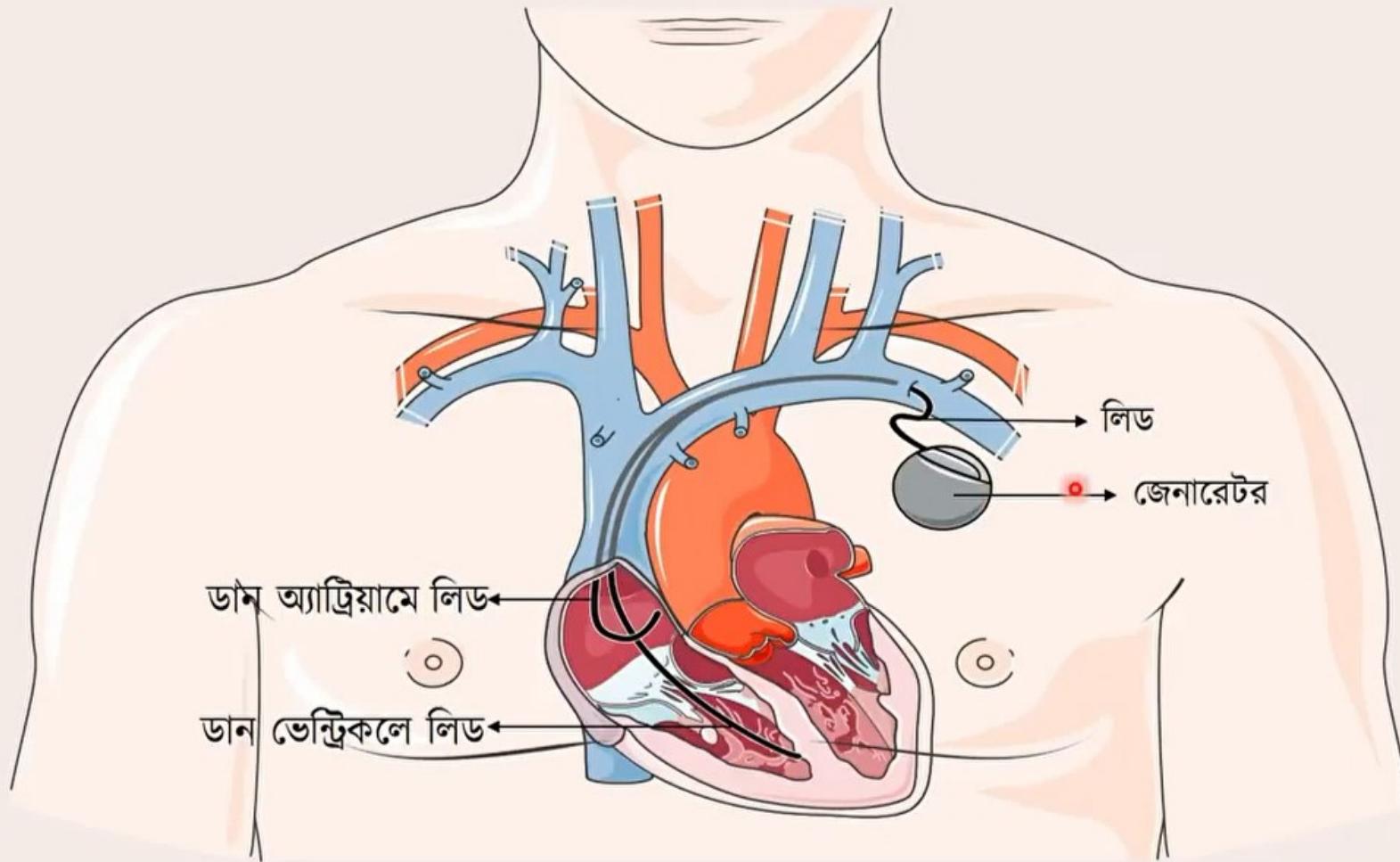


# পেসমেকার (Pacemaker)

## • পেসমেকার যেভাবে কাজ করে

১. জেনারেটরের কম্পিউটার-চিপ এবং হৎপিণ্ডে যুক্ত সেঙ্গরবাহী তার ব্যক্তির চলন, রক্তের তাপমাত্রা, শ্বসন ও বিভিন্ন শারীরিক কর্মকাণ্ড মনিটর করে।
২. প্রয়োজনে কর্মকাণ্ডের ধারা অনুযায়ী হৎপিণ্ডকে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে।
৩. এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে পেসমেকার ঠিক করে দেয় কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাগবে এবং কখন লাগবে। যেমন-পেসমেকার ব্যক্তির ব্যায়াম করার বিষয়টি বুঝতে পেরে হৎস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়।
৪. এসব উপাত্ত পেসমেকারে রাখিত থাকে যা দেখে চিকিৎসকেরা লিড পেসমেকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।
৫. কম্পিউটারের সাহায্যেই যেহেতু পেসমেকারের প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনা যায় তাই পেসমেকারে ছুরি-কাঁচি চালানোর প্রয়োজন পড়ে না।
৬. পেসমেকারের ব্যাটারি অত্যন্ত। **পুরুষপূর্ণ অংশ।** এর মেয়াদ থাকে ৫-১০ বছরের মতো।

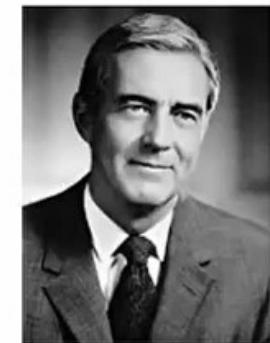




# ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর বুক কেটে উম্মুক্ত করে হৃৎপিণ্ডে অঙ্গোপচার সম্পন্ন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে।

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **Dr. Wilfred G. Bigelow**, ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি প্রয়োগ করেন।



- ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ

ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিচে বর্ণিত তিনি উপায়ে করা হয়।

1. **অন-পাম্প সার্জারি (On-pump surgery)** : এ ধরনের সার্জারিতে একটি হৃদ-ফুসফুস মেশিনে যা কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস (cardiopulmonary bypass) নামে পরিচিত সেটি ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি সাময়িকভাবে হৃৎপিণ্ডের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পাম্প করে বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রেরণ <sup>oxygen</sup> করে। এটি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় শল্যচিকিৎসক যখন অঙ্গোপচার করেন

# ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

## ২. অফ-পাম্প সার্জারি বা বিটিং হার্ট (Off-pump surgery or beating heart) :

এ ধরনের সার্জারিতে হৃদ-ফুসফুস মেশিন ব্যবহৃত হয় না,  
বরং চিকিৎসক সক্রিয় হৃৎস্পন্দনরত হৃৎপিণ্ডেই অঙ্গোপচার করেন।  
তবে হৃৎস্পন্দনের হার ওযুথ প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে  
সামান্য মন্ত্র করে রাখা হয়।



## ৩. রোবট-সহযোগী সার্জারি (Robot-assisted surgery) :

এ ধরনের সার্জারিতে  
শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে  
অঙ্গোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং  
কাজ সম্পন্ন করেন। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে।

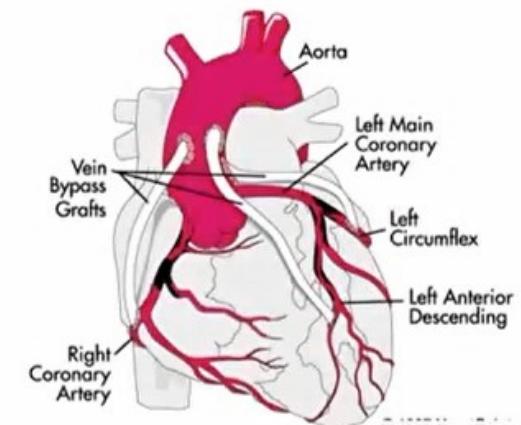
# ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

- ওপেন হার্ট সার্জারি পদ্ধতি

একজন কার্ডিওভার্কুলার শল্যচিকিৎসকের অধীনে একটি শল্যচিকিৎসক দল ওপেন হার্ট সার্জারির মতো জটিল অন্ত্রোপাচার পরিচালনা করেন। সার্জারির শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে সাধারণ অ্যানেস্থেসিয়া (general anesthesia) কিংবা ন্যায়ুবন্ধক অ্যানেস্থেসিয়া (nerve block anesthesia) প্রয়োগ করা হয়। সার্জারি শুরু হয় বুক ও স্টার্নাম কেটে বড়-সড় গর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে। তা না হলে রোগীর ভিতরটা ভালোমতো দেখা যায় না। অন-পাম্প সার্জারি হলে ওষুধ প্রয়োগে হ্ৰস্পন্দন বন্ধ করে দিয়ে হৃদ-ফুসফুস মেশিন (heart-lung machine)-এর সাহায্যে পাম্প করে সারা দেহে রক্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। সার্জারি শেষে মেশিন খুলে নেয়া হয়।



অন্যদিকে, করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা হ্ৰকপাটিকা মেരামত বা পুনঃস্থাপন কৰাৱ সময় সার্জন আৱ প্ৰচলিত বড় ধৰনেৰ কাটা-ছেড়া না কৰে বুকেৰ মাঝামাঝি ছোট ফুটা কৰে তাৱ ভিতৰে ক্যামেৰাযুক্ত যন্ত্ৰ তুকিয়ে রোগীৰ অভ্যন্তৰভাগ দেখেন মনিটৱে। এ প্ৰক্ৰিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে, সংক্ৰমণজনিত জটিলতাও কম। রোগীৰ ব্যক্তিগত পছন্দ, শনাক্তকৰণ, বয়স, অসুখেৰ ইতিহাস, স্বাস্থ্য বুঁকি প্ৰভৃতিৰ উপৰ এ ধৰনেৰ সার্জারি নিৰ্ভৰ কৰে।



# করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

এক বা একাধিক করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) রুদ্ধ হয়ে গেলে হৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহের অন্য অংশ থেকে (যেমন-পা থেকে) একটি সুস্থ রক্তবাহিকা (ধমনি বা শিরা) কেটে এনে রুদ্ধ ধমনির পাশে স্থাপন করে রক্ত সরবরাহের যে বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় তাকে করোনারি বাইপাস বলে। করোনারি বাইপাস সৃষ্টির সামগ্রিক অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়াটিকে করোনারি বাইপাস সার্জারি বলা হয়।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির রুদ্ধতা।  
এর মূল কারণ ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে ত্রুমশ সঞ্চিত হওয়া উচ্চমাত্রার  
কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ। ধমনি প্রাচীরের এভোথেলিয়ামে এগুলো  
জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্ত পুঞ্জিভূত হয়ে শক্ত হতে শুরু করে  
এবং চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে **আর্টেরিওফ্লেরোসিস**  
**(arteriosclerosis)** বলে। আর পুঞ্জিভূত পদার্থগুলোকে বলে  
**অ্যাথেরোমেটাস প্লাকস (atheromatous plaques)**। প্লাকসের  
আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহ বাধার্হিত হয়  
এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন হৎপেশি  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্ত  
না পেলে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়।

# করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

- বুঁকির সম্বন্ধঃ ১. ধূমপান, উচ্চরক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা ও ডায়াবেটিস প্রভৃতি প্লাক মার কাজ ত্বরান্বিত করে।  
২. ৪৫ বছরের বেশি বয়সী পুরুষ ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সী নারীর ক্ষেত্রে কিংবা পরিবারের ইতিহাসে যত করোনারি ধমনি সংক্রান্ত ব্যাধির নজির থাকে।

যখন করোনারি ধমনির লুমেন ৫০-৭০% সংকীর্ণ হয় তখন থেকেই  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ হৎপেশিতে কমে যায়। বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। প্লাকের চূড়ায় যদি রক্ত জমাট বাধে তাহলে পরিস্থিতি হার্ট অ্যাটাকে দিকে চলে যায়।

ধমনির লুমেন যদি ৯০-৯৯% সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন অস্থির অ্যানজাইন (unstable angina) ত্বরান্বিত হয়। এমন অবস্থায় করোনারি বাইপাস কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

করোনারি বাইপাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। রোগ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় হৃৎচিকিৎসক প্রথমে করোনারি ধমনির রোগের সঠিক অবস্থান, ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয় করেন। পরবর্তী ধাপে রোগীর হৃৎপিণ্ড, বয়স, লক্ষণের ব্যাপকতা, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের অবস্থা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিবেচনা করে হৃদ ও শল্যচিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। রুদ্ধ করোনারি ধমনিকে এড়িয়ে ভিন্নপথ নির্মাণ করতে বুক, হাত, পা ও তলপেট থেকে ধমনি সংগ্রহ করা হয়। কয়টি করোনারি ধমনি বাইপাস করতে হবে তার উপর নির্ভর করে অঙ্গোপচারের সময়কাল। সাধারণত ৩-৫ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বাইপাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে ২ মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এরপর থেকে রোগীকে নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হয়।

# করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

- **বিধিনিষেধ**

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন- ধূমপান ত্যাগ; কোলেস্টেরলের চিকিৎসা; উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ; ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ; নিয়মিত নির্ধারিত ব্যায়াম; স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা; হৃদ-বান্ধব ভোজনে অভ্যন্ত হওয়া; চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা; নির্ধারিত ওষুধ সেবন; এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা।



# এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

বড় ধরনের অস্ত্রোপচার না করে হৎপিণ্ডের সংকীর্ণ লুমেন (গহ্বর) যুক্ত বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেন যুক্ত বান উন্মুক্ত করার পদ্ধতিকে এনজিওপ্লাস্টি (angio = রক্তবাহিকা + plasty = পুনর্নির্মাণ) বা করোনারি এনজিওপ্লাস্টি (coronary angioplasty) বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভিতর দিয়ে হৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত  $O_2$  সরবরাহ নিশ্চিত করে হৎপিণ্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা), হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির সহজ উপায় এনজিওপ্লাস্টি।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অ্যানড্রেস গ্রেনজিগ (Dr. Andreas Gruentzig) সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।



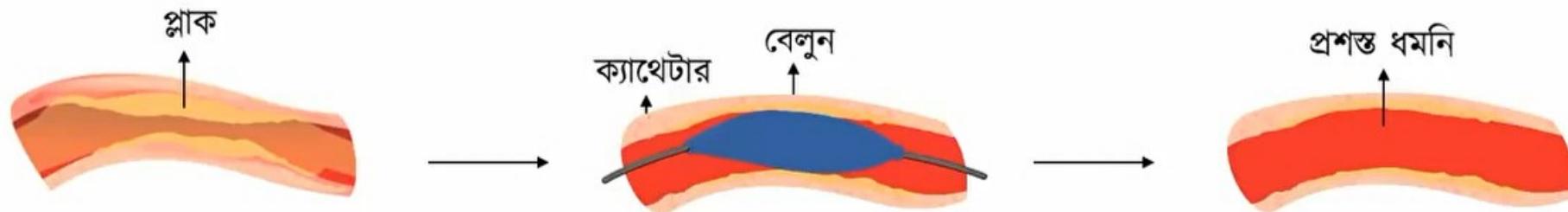
## এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ

এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) চওড়া করে  $O_2$ -সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অন্তর্মুক্ত রাখা। প্লাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টির ধরনও **বিভিন্ন** হয়ে থাকে। এনজিওপ্লাস্টি

# এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

## ১. বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (Balloon angioplasty):

এ ক্ষেত্রে একটি বেলুন ক্যাথেটার (balloon catheter) ধমনিতে প্রবেশ করিয়ে কোলেস্টেরলের পিণ্ডগুলোকে ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং রক্তনালিকে খোলা রাখতে সেখানে প্রায়ই একটি স্টেন্ট স্থাপন করা হয়।



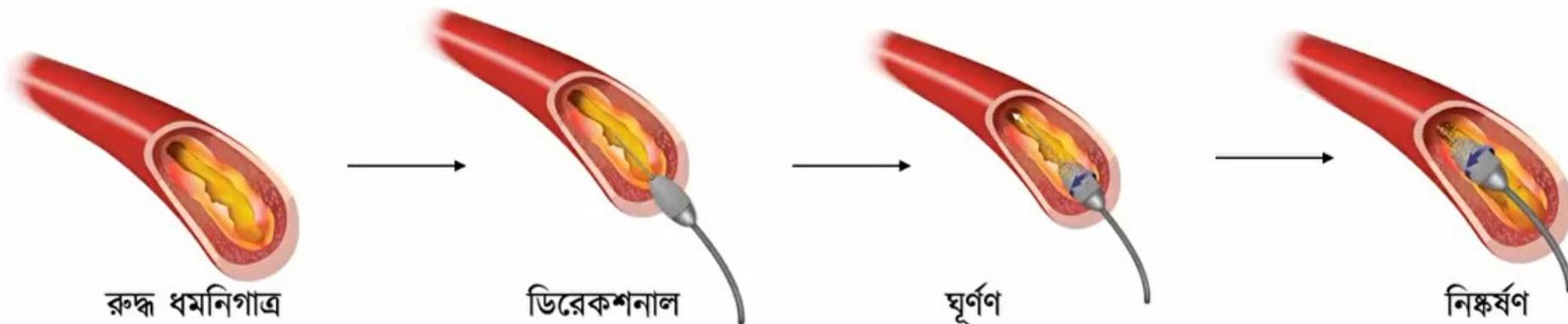
## ২. লেজার এনজিওপ্লাস্টি (Lesser angioplasty) :

এ ধরনের এনজিওপ্লাস্টিতে ক্যাথেটারের আগায় বেলুনের পরিবর্তে একটি লেজার লাগানামে থাকে। করোনারি ধমনির প্লাকযুক্ত অংশে পৌছে লেজার রশ্মি স্তরে স্তরে প্লাক ধ্বংস করে এবং গ্যাসীয় কণায় বাস্পীভূত করে দেয়। শুধু লেজার নয়, এ প্রক্রিয়াটি বেলুন এনজিওপ্লাস্টির পাশাপাশি প্রয়োগ করা যায়।



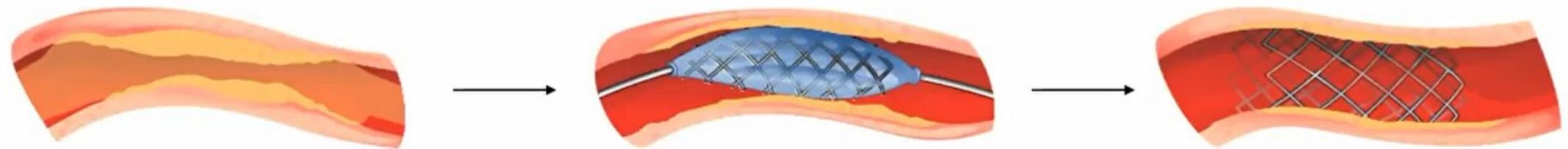
### ৩. করোনারি অ্যাথেরেকটমি (Coronary atherectomy) :

এটিও এনজিওপ্লাস্টির মতো একটি প্রযুক্তি তবে এক্ষেত্রে ধমনি-প্রাচীরের প্লাককে বেলুনের সাহায্যে চেপে লুমেন প্রশস্ত করার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র, যেমন ক্ষুদ্র ঘূর্ণী ব্রেড, ড্রিল, বেলুন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।



### ৪. করোনারি স্টেন্টিং (Coronary stenting):

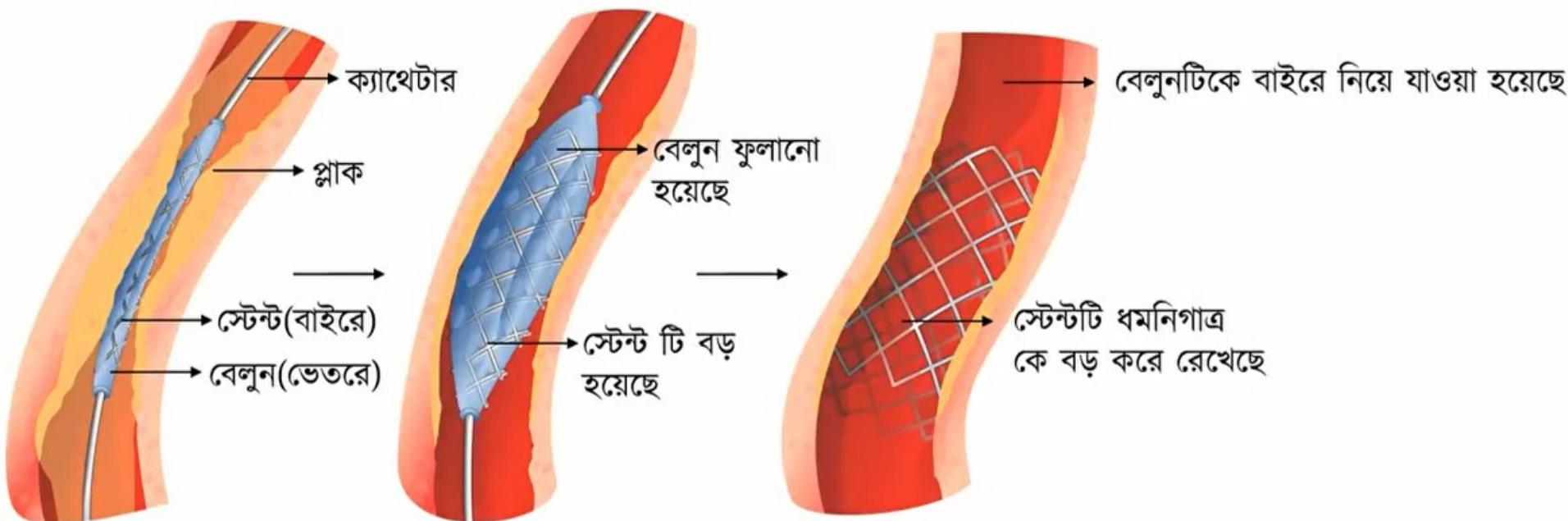
স্টেন্ট হচ্ছে ক্ষুদ্র কিন্তু প্রসারণযোগ্য, ধাতব যন্ত্র যা এনজিওপ্লাস্টি সম্পর্কে হলে ক্যাথেটারের সাহায্যে সংকীর্ণ ধমনি-লুমেনে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। লুমেন যেন আবারও সংকীর্ণ না হতে পারে সে কারণে স্টেন্ট-কে সেখানেই রেখে দেয়া হয়। অর্থাৎ যাদের করোনারি ধমনি বেশ নাজুক তাদের ক্ষেত্রে স্টেন্ট অত্যন্ত উপযোগি।



করোনারি স্টেনটিং (Coronary stenting):

## এনজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়া

এনজিওগ্রাম (angiogram) করে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ধরনের সার্জারি করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে উর্ধ্ববাহু বা পা এর একটি অংশ কেঁটে ধমনির ভিতর দিয়ে পাতলা নল বা ক্যাথেটার (catheter) প্রবেশ করিয়ে কৌশলে রঞ্জ সা আংশিক বুজে যাওয়া ধমনিতে পৌছানো হয়। ক্যাথেটারে একটি সরু তার, তারের অগ্রভাগে একটি চুপসানো বেলুন ও বেলনটির চারদিকে একটি ধাতব তারের জালের চোঙ বসানো থাকে। জালিকাটিকে স্টেন্ট (stent) বলে। স্টেন্টটি সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এখন অবশ্য অন্যান্য ধাতব বা **বিশেষ** ধরনের সুতার তৈরি স্টেন্টও ব্যবহৃত হয়।



## এনজিওগ্রাস্টির উপকারিতা

- ★ করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভিতর ব্লক সৃষ্টি  $O_2$  –সমৃদ্ধ রক্ত হৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপ্লাস্টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
- ★ এনজিওপ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথা, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। যেহেতু বুক উন্মুক্ত করতে হয় না সেহেতু কষ্ট ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘন্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।
- ★ যারা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাঁদে বয়স ৭৫ বছরের বেশি ০ তাঁদের ক্ষেত্রে

## স্ট্রোক (Stroke)

আমরা অনেক সময় হাত অ্যাটাককে স্ট্রোকের সাথে গুলিয়ে ফেলি। অনেককে বলতে শোনা যায় ওমুকের হাত স্ট্রোক করেছে। কথাটা একেবারেই ভুল। স্ট্রোকের সাথে হৃৎপিণ্ডের সরাসরি সংযোগ নেই।

### তাহলে স্ট্রোক কী ?

মন্তিক্ষে রক্ত সরবরাহকারী কোনো ধরনের (যেমন-ক্যারোটিড) বা এদের শাখা-প্রশাখার ভিতর তপ্তন পিণ্ড বা ব্লকেজ সৃষ্টির ফলে রক্তের সরবরাহ বিঘ্নিত বা বন্ধ হওয়াকে স্ট্রোক বলে। এর ফলে রক্তনালি ফেটে গিয়ে মন্তিকে রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে।

### স্ট্রোকের কারণ :

- (i) মন্তিক্ষগামী কোনো ধরনের অন্তর্গাত্রে মেহ পদার্থ বিশেষত কোলেস্টেরল জমে তপ্তন পিণ্ড সৃষ্টি
- (ii) উচ্চ রক্তচাপের দরুণ মন্তিক্ষের কোনো ধরনের অনিয়ন্ত্রিত সংকোচন বা আক্ষেপ
- (iii) প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্য গ্রহণ
- (iv) অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, দীর্ঘ দিনের কিডনি রোগ
- (v) ধূমপান বা মদ্যপান
- (vi) অলস জীবন-যাপন, বার্ধক্য অবস্থা, স্তুলতা, মানসিক চাপ বা পীড়ন ইত্যাদি কারণে স্ট্রোক হতে পারে।

### লক্ষণ:

- (i) প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, অস্থিরতা, শারীরিক দুর্বলতা, অদ্বিতীয়, বমি উদ্বেক, গলার দুই পাশের রক্তনালি ফুলে যাওয়া
- (ii) স্ট্রোকের ফলে স্মৃতিভঙ্গ, বাকলোপ, চেতনালোপ বা জ্ঞান হারানো, প্যারালাইসিস, নাক ও মুখ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ, এমনকি রোগীর আকস্মিক মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

### করণীয়/প্রতিকারঃ

- (i) সচল জীবন-যাপন, নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটা-চলা;
- (ii) খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, টাটকা শাক-সবজি ও ফলমূল বেশি করে খাওয়া; অতিরিক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্য কম খাওয়া বা বর্জন,পাতে লবণ বর্জন
- (iii) দৈহিক ওজন, ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখা
- (iv) ধূমপান পরিহার
- (v) দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন-যাপন
- (vi) স্ট্রোক হলে রোগীকে দ্রুত ক্লিনিক বা হাসপাতলে নিয়ে যেতে হবে, প্যারালাইল ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা।